পলাতক

জাফর চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী

banglabooks.in

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার-৫৪

রোমহর্ষক সিরিজের সপ্তম রোমাঞ্চোপন্যাস

পলাতক

জাফর চৌধুরী

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি পি ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

POLATOK
By : Jafor Choudhury

পরিচয়

বাঙালী দুই ভাই, রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ।
বাবা-মায়ের সংগে থাকে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের
ছিমছাম সুন্দর শহর বেপোর্ট-এ।
বাবা মিস্টার ফিরোজ মুরাদ দুঁদে গোয়েন্দা।
বাবার মতোই গোয়েন্দা হতে চায় দুই ভাই,
অ্যাডভেঞ্চার পাগল।
সুযোগ পেলেই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালায়,
ভয়ংকর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হয় মৃত্যুর মুখোমুখি।
বেপরোয়া, দুর্ধর্ষ, সুদর্শন ওই দুই তরুণকে নিয়েই
রোমহর্ষক সিরিজের কাহিনী।

সেবা প্রকাশনী

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ত্রুটি যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টোপাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে রাখলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দিষ্টায় পাঠিয়ে দিন।

প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। লেখক।

banglabooks.in

এক

চারপাশে তাকালো রেজা মুরাদ। নির্জন শাদা সৈকতের সীমানায় ঝালর তৈরি করেছে যেন পাম গাছের সারি।

ঘামে ভেজা চুলগুলো কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিলো সুজা মুরাদ। কড়া রোদ লাগছে মুখে। সকালে বেপোর্ট থেকে পরে আসা সোয়েটশার্ট আর জিনসের প্যান্ট সেদ্ধ করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে এখন তাকে। কিন্তু তখন, মায়ামির উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় আবহাওয়া ছিলো অন্য রকম। পথে এক জায়গায় তো তুষার-ঝড়ই পেরোতে হয়েছে।

রেজার পরনেও একই পোশাক, শুধু তার সোয়েটশার্টের বুকে ছাপা একজন চীনা কুংফু-স্টারের ছবি। এই জামাটা পরতে সে গর্বই বোধ করে। কারাতে ব্রাউন বেল্ট পেয়েছে সে। আশা আছে, একদিন না একদিন ব্ল্যাক বেল্ট আসবেই।

'কেসটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে না পারলে,' রেজা বললো,

'এবারের বড়দিনের ছুটিটা মাঠে মারা যাবে। বেড়াতে আর যেতে পারবো না।' দরদর করে ঘামছে সে-ও। সাঁতারু আর সূর্যস্নানার্থীরা এখনও এসে পৌঁছায়নি এই সৈকতে। ওদের আগে আসার জন্যেই তো এই পরিশ্রম, পাঁচ মাইল পথ প্রায় দৌড়ে পেরিয়েছে।

'সুইমস্যুট পরে এলেও হতো, অন্তত পানিতে তো নামতে পারতাম,' সুজা বললো। দক্ষিণাঞ্চলের ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাত ছড়ালো সে, টানটান করে শক্ত হয়ে যাওয়া পেশীগুলোকে ঢিল করতে চাইলো, প্লেনে বসে থেকে থেকে জমাট বেঁধে গেছে যেন। 'দাদা, তুমি শিওর, সাঁতারের সময় পাবো না আমরা?'

'ভুলে যা ওকথা। ছুটি কাটাতে আসিনি আমরা এখানে।'

'আর মনে করিয়ে দিও না। ছুটি কাটাতে তো কোনোখানেই যাই না আমরা। যেখানেই যাই কিছু না কিছু একটায় জড়িয়ে গিয়ে ছুটি মাটি। শান্তিতে কাটানোর কাজ সারা।' কপাল ডললো সে। 'তবে ইচ্ছে করলে এবারের ছুটিটায় আনন্দ করতে পারি আমরা। একটা বীচ হাউস ভাড়া নিতে পারি সহজেই,' ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'যদি খালি তোমার হাতের স্যুটকেসটা একটু ঝাড়া দাও...'

'থাম, সুজা,' গম্ভীর হয়ে বললো রেজা।

'তোমাকে নিয়ে এই এক সমস্যা। সব কিছুকেই সিরিয়াসলি নাও। এতোটা না হলেও চলে...'

'চলে না। তাহলে অনেক আগেই মরে ভূত হয়ে যেতাম। তুই

যে রকম খামখেয়ালি করিস, সিরিয়াস না হয়ে উপায় আছে আমার।'

'না, নেই। প্লেন থেকে নামার পর ব্যাগটাকে যে ভাবে আঁকড়ে ধরে ছুটে এসেছো এখানে, যে কেউ দেখলে ভাববে ওটাতেই তোমার জীবন মরণ!' নিজেদের কাপড়ের ব্যাগগুলোর পাশে সৈকতে পড়ে থাকা চামড়ার দামী অ্যাটাচি কেসটার দিকে তাকালো সুজা। 'কাকে ভয় তোমার, আমাকে? ভেবেছো গোল্ড কোস্টে পৌঁছেই ওটা কেড়ে নিয়ে দোকানে ছুটবো খরচ করার জন্যে?'

'তোকে বিশ্বাস নেই,' রেজা হাসলো। 'কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে যাবি ঠিক আছে? পটিয়ে পাটিয়ে তোর কাছ থেকে পুরোটা হাতিয়ে নিলেও অবাক হবো না।'

'এতো গাড়োল মনে করো নাকি আমাকে,' ভাইয়ের হাসি ফিরিয়ে দিলো সুজা। 'আচ্ছা, ঠিক আছে, খরচ নাহয় না-ই করতে দিলে, আরেকবার চোখের সাধ তো অন্তত মেটাতে দেবে। ওই জিনিস পাওয়ার আশা আমার স্বপ্নেও হবে না।'

দ্বিধা করলো রেজা। তারপর বললো, 'বেশ, তবে এক সেকেণ্ডের বেশি না।' বলতে বলতে কেসটার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে। তালা খুলে ডালা তুললো।

প্রথমবার যেমন তাকিয়েছিলো, এবারেও স্তব্ধ হয়ে কয়েক সেকেণ্ড থরে থরে সাজানো কেস বোঝাই নোটের বাণ্ডিলের দিকে তাকিয়ে রইলো দুই ভাই।

'হয়েছে,' বলেই কেসের ডালা নামিয়ে দিলো রেজা। কট করে লেগে গেল তালা।

এতো তাড়াতাড়ি বন্ধ করায় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো সুজা, এই সময় কানে এলো গাড়ির হর্ন। পাম গাছগুলোর ওপাশে : একবার···দু'বার···তিনবার।

ঘড়ি দেখলো রেজা। 'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় হাজির হয়েছে।' সতর্ক হয়ে উঠেছে তার চোখের তারা। পকেট থেকে একটা হুইসেল বের করে তিনবার বাজালো।

অপেক্ষার পালা। সব নীরব। যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মিনিট-খানেক পর পামের সারি থেকে বেরিয়ে এলো শোফারের পোশাক পরা একজন ছোটখাটো মানুষ। রেজা সুজাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত নেড়ে ইশারা করলো। আদেশ না মেনে উপায় নেই ওদের। লোকটার আরেক হাতে বিশাল একটা নিকেল প্লেটেড অটোম্যাটিক, বিকেলের উজ্জ্বল রোদে ঝকঝক করছে, নলের মুখ স্থির হয়ে আছে ওদের দিকে।

লোকটার কাছে পৌঁছলো ওরা। সে বললো, 'নিশ্চয় রেজা আর সুজা,' কথায় ব্রিটিশ টান।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো রেজা।

'ভদ্রলোকের ডাকনাম ধরে ডাকার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু এটাই কোম্পানির নিয়ম।'

'তোমার কি নাম?' রেজাও ভদ্রতা দেখালো না।

কঠিন এক চিলতে হাসি ফুটলো লোকটার ঠোঁটে। 'আমাকে

নোভা বলে ডাকতে পারো।' বোঝা গেল, আসল নাম বলেনি। পিস্তলের ইশারায় আরও কাছে ডাকলো দু'জনকে। 'দেখি, এবার টিকেট দেখাও। তারপর যাচ্ছি আমরা।'

'টিকেট?'

অ্যাটাচি কেসটার দিকে ইশারা করলো পিস্তল।

'ও, বুঝেছি।' কেসটা খুললো রেজা।

ভেতরে তাকালো একবার নোভা, মাথা ঝাঁকালো। 'ভেরি গুড, স্যার,' বদলে গেল কণ্ঠস্বর। 'আসুন তাহলে, এবার আমরা যেতে পারি।'

লোকটার এসব যান্ত্রিক কথাবার্তা একটুও পছন্দ হলো না সুজার। বললো, 'একটা কৌতূহল মেটাবে?' পিস্তলটার দিক থেকে নজর সরিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। 'যদি টিকেট না থাকতো আমাদের, কি হতো তাহলে? ট্রেন আমাদের ফেলে রেখেই চলে যেতো?'

'মোটেই না, স্যার। নিয়েই যেতো। তবে সেটা মোটেও পছন্দ করতেন না আপনারা।'

'বুঝতে পেরেছি,' হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলো সুজা। 'ওয়ান ওয়ে লাইন নিশ্চয়। গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে, কিন্তু ফেরত আর আসা যাবে না।'

'ভালোই বলেছেন, স্যার। যদি আর কোনো প্রশ্ন করার না থাকে...,' তাহলে কি করতে হবে পিস্তল নেড়ে হাঁটার ইশারা করে বুঝিয়ে দিলো নোভা। যেতে হবে পাম গাছগুলোর দিকে।

গাছের সারির ওপাশে একটা রাস্তা। পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মস্ত একটা ধূসর রঙের লিমোসিন। চকচকে পালিশ করা শরীর, জানালায় গাঢ় রঙের কাঁচ।

'উঠুন আপনারা,' নোভা বললো। এক হাতে খুলে ধরেছে পেছনের দরজা, আরেক হাতে উদ্যতই রয়েছে রূপালী রঙের অটোম্যাটিক। ওদের খুব কাছেই ওটার মুখ।

ওরা দেখলো, গাড়ির ভেতরে অনেক জায়গা। চামড়ায় মোড়া নরম গদিওয়ালা সীট, একটা টেলিভিশন সেট, এমনকি একটা বিল্ট-ইন বারও রয়েছে।

'খদ্দেরের টাকার মূল্য দাও তোমরা, বোঝা যাচ্ছে,' সুজা বললো। 'আর মূল্যবান লোকের জন্যেই তৈরি হয়েছে মনে হয় এই চলমান বার।'

'দয়া করে যদি ওঠেন এখন,' অধৈর্য হয়ে উঠেছে নোভা, সেটা প্রকাশ হয়েই গেল, তবে খুব সামান্য।

'নিশ্চয় নিশ্চয়,' গাড়ির ভেতরে নিজের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেললো সুজা। পেছনের সীটে বসলো। রেজা উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, তালা লেগে গেল কিট করে। আলো জ্বলে উঠলো।

দু'পাশের আর পেছনের জানালায় কালো কাঁচ তো আছেই, ওদের সামনেও প্ল্যাস্টিকের বেড়া, ড্রাইভারের সীট থেকে আলাদা করে দিয়েছে পেছনের সীটটা।

'কি জানালা, হাহ্,' সুজা বললো। 'বাইরের কেউ ভেতরটা

দেখতে পাবে না, অথচ ভেতরের ওরা সহজেই বাইরে দেখতে পাবে। কিছু কিছু বড়লোকের কাণ্ডকারখানা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়।'

'এই গাড়ির কাঁচ পয়সাওয়ালাদের জন্যে বানানো হয়েছে ঠিকই,' রেজা বললো, জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে, 'তবে এটা দিয়ে বাইরেও দেখতে পাবে না। ইচ্ছে করেই লাগানো হয়েছে এই কাঁচ। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে দেখতে না পারে কাস্টোমাররা।'

'বেশ, তাহলে আমার মন্তব্য একটু পরিবর্তন করছি,' সুজা বললো। 'শুধু খামখেয়ালি বড়লোকেরাই এই গাড়ি ব্যবহার করে না। অন্যেরাও করে।'

'যেমন?'

'যাদের মরার সাধ জাগে তারাও চড়ে এটাতে।'

হাসি চলে গেল রেজার মুখ থেকে। ভাইয়ের মনের কথা পড়ে ফেলেছে। নিচু গলায় বললো, 'রাজকীয় গাড়িতে চড়িয়ে এখন আমাদেরকে দাফন করতে না নিয়ে গেলেই বাঁচি!'

দুই

অথচ আগের দিনও কবর নিয়ে মাথাব্যথা ছিলো না দু' ভাইয়ের। মনে ছিলো বড়দিনের ভাবনা। অনেক জায়গায় দাওয়াত পড়েছে। খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না, উপহার কিনতে হবে, সেগুলো কেনা হয়নি তখনও। সময় আছে আর মাত্র একহপ্তা।

সকালে নাস্তার পর রেজার ঘরে বসে আলোচনা করছিলো দু'-জনে কি কি কেনা যায়।

'বেশ,' সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে চটে গিয়েছিলো সুজা, 'ইরার জন্যে কি কিনবে না কিনবে সেটা তোমার ব্যাপার।'

'আমিও বলতে পারি ওরকম করে। বেপোর্টের অর্ধেক মেয়ের জন্যে কি কিনবি সেটা তোর ব্যাপার।'

'হিংসে হচ্ছে নাকি তোমার ?'

'তোর মতো পাগল নাকি আমি। যে মেয়ে দেখবো তার পেছ-নেই লেগে যাবো।'

কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আবার শান্ত হয়ে এলো দু'জনে। আবার চললো পরামর্শ। একমত হতে পারলো না এবারেও। আবার লেগে যাওয়ার সময় হয়েছে, এই সময় রেজা বললো, 'এক কাজ করা যেতে পারে। আমাদের মাথায় যখন কুলাচ্ছে না, আমার কমপিউটারটাকে জিজ্ঞেস করে দেখি কি বলে?'

'চমৎকার আইডিয়া,' তুড়ি বাজালো সুজা।

কিন্তু কমপিউটারে কাজ করতে বসার আগেই টেলিফোন বাজলো।

'ধরো গিয়ে,' হেসে বললো সুজা। 'নিশ্চয় ইরা।'

ফোন ধরলো রেজা। মেয়ে-কণ্ঠই, তবে ইরিনা নয়।

'কে, রেজা? ডবসি,' মেয়েটা বললো। 'আশা করি বিরক্ত হচ্ছো না। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। ইরা ফোন নম্বর দিতে চাইছিলো না, জোর করে নিয়েছি।' দ্বিধা করলো ডবসি। 'বলেছি, আমার জীবন-মরণ সমস্যা।'

সতর্ক হয়ে উঠলো রেজা। অন্য কোনো মেয়েকে তার নম্বর সহজে দিতে চাইবে না ইরিনা। জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'সামনাসামনি বললেই ভালো হতো, আমার বাড়িতে,' ডবসি বললো। 'প্লীজ, কিছু যদি মনে না করো, চলে এসো না। তুমি আর সুজা। তোমাদের দু'জনকেই আমার দরকার। সাহায্য চাই তোমাদের...,' থেমে গেল সে। তবে তার কণ্ঠ ধরই বুঝিয়ে দিলো ব্যাপারটা সত্যি জরুরী।

'আসছি।'

'থ্যাংকস্। প্লীজ, জলদি করো,' লাইন কেটে দিলো ডবসি।

'আয়,' ভাইকে বললো রেজা। 'ডবসি কুপারের বাড়ি যেতে হবে।' কোট বের করার জন্যে আলমারির দিকে এগোলো সে।

প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করলো না সুজা। রেজার চোখ দেখেই বুঝেছে, রহস্যময় কিছু ঘটেছে। এসব ব্যাপারে তার নিজের কৌতূহলও কিছু কম নয়। কোট আনার জন্যে সে-ও দৌড় দিলো তার ঘরে। তাড়াহুড়ো করে কোট নিয়ে যখন নিচে নামলো, ভ্যানের ড্রাইভিং সীটে ততোক্ষণে উঠে বসেছে রেজা। সকালের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে এঞ্জিনও ঠাণ্ডা হয়ে আছে, চালু করে দিয়ে সেটা গরম করছে সে। ভাইয়ের পাশে উঠে বসলো সুজা।

ডবসির বাড়ির দিকে চলতে চলতে কথা বলার সুযোগ মিললো।

'ওই স্বর্ণকন্যার আবার কি সমস্যা হলো?' ডবসিকে ওই নামে ডাকে স্কুলের অনেকেই। তাদের মাঝে সুজাও একজন।

'উচিত না, বুঝেছিস,' রেজা বললো। 'টাকা আছে অনেক, ঠিক, তবু কাউকে ওভাবে ডাকা ঠিক না। ডবসির সব কিছু আছে, এটা তার দোষ নয়।'

'জানি। চেহারা ভালো, মাথা ভালো, আত্মসম্মান আছে। আর আছে প্রচুর টাকা, যা দিয়ে সব কেনা যায়।'

'তা যায়, শুধু মা বাদে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো রেজা। ডবসির মা মারা গেছে তার জন্মের সময়। 'সে-জন্যেই বোধহয় সবাই তাকে পছন্দ করে।'

'ওর বাপও খুব ভালো,' পথের দিকে তাকিয়ে বললো সুজা।

এখানে ওখানে পানি জমে রয়েছে, নিশ্চয় বরফের মতো ঠাণ্ডা, না ছুঁয়েও বলে দেয়া যায়।

'হ্যাঁ, মিস্টার কুপার লোক ভালো, এতো ব্যস্ততার মাঝেও মেয়ের জন্যে সময় বের করে নেন। গল্প করেন, গল্প শোনেন, বেড়াতে যান। মায়ের অভাব পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।'

'ডবসিও বাবাকে খুব পছন্দ করে।'

ডবসিদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালো রেজা। মস্ত বাড়ি। সামনে ছড়ানো লনে যেন তুষারের চাদর বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

'সেই যে পার্টির পর আর আসিনি,' রেজা বললো। 'কি মনে হয় তোর, ওদের কাজের মেয়েটা আমাদের চিনবে?'

হাসতে হাসতে এসে দরজার বেল বাজালো সুজা। 'না চেনার ভান করাই স্বাভাবিক। মানুষের কঙ্কাল দেখিয়ে সেবার যা ভয় পাইয়েছিলে ওকে।'

দরজা খুলে দিলো একটা মেয়ে। কিন্তু এ যেন রেজা সুজার পরিচিত ডবসি কুপার নয়। চেহারা ফ্যাকাশে, মুখের সার্বক্ষণিক হাসিটা নেই, চলাফেরায় অস্বস্তির ভাব, অস্থির। পথ দেখিয়ে ছেলেদের ভেতরে নিয়ে এলো সে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো এতোক্ষণে। বললো, 'তোমাদের দেখে কি যে খুশি হয়েছি...'

'তা ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইলো রেজা।

'লাইব্রেরিতে এসো, দেখাচ্ছি।' আবার পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে চললো ডবসি। হলওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'বাড়িটা

যে এতোবড়, আজকের আগে কখনও বুঝতেই পারিনি। আসলে আগে এরকম একা হইনি তো আর। বাবা নেই। কাজের মেয়েটাকে বাড়ি চলে যেতে বলেছি।'

লাইব্রেরিতে ওক কাঠে তৈরি একটা অ্যানটিক টেবিলে রাখা দামি চামড়ার একটা অ্যাটাচি কেস। একটানে ওটার ডালা তুলে দেখালো ডবসি। হাঁ হয়ে গেল দুই ভাই।

'একশো ডলারের নোট!' বিড়বিড় করতে করতে কাছে এগোলো রেজা। 'সবই কি একশো ডলার নোটের বাণ্ডিল?'

'সব,' ডবসি বললো।

'অনেক টাকা,' অবশেষে কথা ফুটলো সুজার মুখে। 'ব্যাংক ডাকাতি করা হয়েছে নাকি?'

কান্না এসে যাচ্ছিলো, সামলালো ডবসি।

'সরি,' তাড়াতাড়ি বললো সুজা। 'এমনি বলেছি, ঠাট্টা।'

'না না, আমি কিছু মনে করিনি। তুমি তো জানো না। কেউই জানে না...এখনও।'

'কি জানে না?'

'বাবার কথা।' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো ডবসি।

অপেক্ষা করছে দু'জনে। চুপ থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করারও নেই।

একটু পরেই অবশ্য চুপ হয়ে গেল ডবসি। মুখ তুললো। চোখ লাল হয়ে গেছে। 'সরি।' ঠোঁট কামড়ালো সে। 'সব বলবো তোমাদেরকে। হয়তো আন্দাজ করতে পারবে কিছু, সাহায্যও

করতে পারবে।'

টেবিলের পাশে রাখা খাড়া উঁচু পিঠওয়ালা একটা চেয়ারে বসে পড়লো ডবসি। রেজা সুজাও বসলো। ওদের সামনে পড়ে আছে খোলা কেসটা, যেন জটিল একটা প্রশ্নের মতো।

কিন্তু টাকা নয়, বাবার কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করলো ডবসি। 'বাবা এখন জেলখানায়। শাদা পোশাকে দু'জন পুলিশ এসে গত-কাল তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।' লম্বা দম নিলো সে। 'চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাকে। ম্যাক্সটেল-এর কোটি কোটি ডলার নাকি মেরে দিয়েছে। ওই কোম্পানির ভাইস-প্রেসি-ডেন্ট ছিলো বাবা। আর···'

'তোমার বাবা!' অবাক হয়ে ডবসির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রেজা।

'ওরকম কাজ করতেই পারেন না!' সুজা ভাইয়ের অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করে দিলো।

'সেটা আমি জানি, তোমরা জানো, কিন্তু আইন জানে না। আর এই অ্যাটাচি কেস বোঝাই টাকা ব্যাপারটাকে আরও গোল-মেলে করে দিয়েছে।'

'কিভাবে হলো?' জানতে চাইলো রেজা।

'আজ সকালে আমার সঙ্গে কথা বলেছে বাবা। কিছু কাপড়-চোপড় আর দরকারী জিনিস নিয়ে যেতে বলেছে। কারণ জেলেই থাকতে হবে তাকে, জামিন দেয়নি।'

ডবসির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে রইলো রেজা

সুজা।

'আজ সকালে,' ডবসি বললো, 'আলমারি থেকে বাবার কাপড় বের করতে গিয়ে এই কেসটা পেয়েছি। অন্য সময় হলে খুলতাম না। কিন্তু আজ সন্দেহ হলো। খুললাম। খুলে ভালো করেছি। কারণ বিশ মিনিট পরেই সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিশ এলো। আমার ঘরে এটা লুকিয়ে না রাখলে নিশ্চয় পেয়ে যেতো ওরা। আর পেলে অবস্থাটা কি হতো কল্পনা করতে পারো?'

'পারছি,' টাকার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো রেজা।

'তুমিও নিশ্চয় ভাবছো না···মানে···,' ডবসি আর এগোতে পারলো না।

'দেখো, ডবসি,' শান্তকণ্ঠে বললো রেজা, 'উনি তোমার বাবা। তুমি তাঁর সম্পর্কে যা ভাববে, অন্যেরাও তা-ই ভাববে আশা করতে পারো না।'

'আরে না না, ভয় পেও না,' হাত তুললো সুজা, 'খারাপ দিকটা থেকেই শুরু করার স্বভাব আমার ভাইয়ের। দাদা যেমন জানে, আমিও জানি, তোমার বাবা এরকম কাজ করতেই পারেন না।'

'ধন্যবাদ, সুজা,' তার বাহুতে হাত রাখলো ডবসি। রেজার দিকে ফিরলো। 'ঠিকই বলেছো, রেজা, যে কেউ দেখলে খারাপই ভাববে। সে যাই হোক, কোর্টে বাবার পক্ষে লড়বে তার উকিল। কিন্তু তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে বাইরে থেকেও চেষ্টা চালাতে হবে। সেজন্যেই তোমাদের ডেকেছি। সাহায্য করার

জন্যে। করবে?'

'জাদু দেখাতে পারবো না আমরা, ডবসি,' রেজা বললো। 'তবে সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। শেষ অবধি কি হবে বলতে পারি না। এমনও হতে পারে, তদন্তে আরও খারাপ কিছু বেরিয়ে পড়বে, তখন সেটা পুলিশকে জানাতে বাধ্য হবো আমরা। বুঝতে পেরেছো আমার কথা?'

'বুঝেছি। তবু আমি চান্স নিতে চাই,' এই প্রথম ডবসির চোখে আশার আলো ঝিলিক দিতে দেখলো দুই ভাই।

নাক কুঁচকালো ডবসি। 'সমস্যা হলো, তেমন কোনো সূত্র দিতে পারবো না, যা নিয়ে সহজেই এগোতে পারো। বাবা বলেছে, তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে এখন একমাত্র টেরিয়ানো হেস, কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। দু'জনে মিলে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু কোম্পানি কেনার চেষ্টা করছিলো। প্রথমে টাকা গায়েব হলো, তারপর হেস। হেস নিখোঁজ হওয়ায় ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়েছে, পুলিশ এখন ভাবছে, এর পেছনেও বাবার হাত রয়েছে। এমনকি ইঙ্গিতও দিয়ে ফেলেছে ওরা, টাকা মেরে দেয়ার ব্যাপারটা জেনে ফেলবে বলেই হেসকে সরিয়ে দিয়েছে বাবা।' এক মুহূর্ত থামলো সে। 'চুরির দায় তো ভালোই ছিলো, খুনের দায় চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে এখন।'

'তারমানে আমাদের কাজ হলো এখন হেসকে খুঁজে বের করা,' আনমনে টেবিলে টাট্টু বাজালো রেজা।

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ডবসি। 'সেটাই করার চেষ্টা

করেছে বাবা গত হপ্তায়। আরও অনেকেই করেছে। লাভ হয়নি। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে হেস।'

থমথমে নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো ঘরে। কারও মুখে কথা নেই। তিনজনেই ভাবছে। হঠাৎ বাজলো টেলিফোন। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডবসি।

'হ্যালো,' রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বললো সে। চুপ করে শুনলো ওপাশের কথা। 'একটু ধরুন, প্লীজ।' মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রেজার দিকে ফিরলো ডবসি। 'বাবাকে চায়। কি বলবো?'

দুই লাফে পৌঁছে গেল রেজা। 'দেখি, দাও।'

কণ্ঠস্বর ভারি করে ধীরে ধীরে বললো সে, 'হ্যালো, ডেভিড কুপার বলছি।'

মোলায়েম গলা শোনা গেল ওপাশ থেকে, মহিলা কণ্ঠ, যেন মেশিনে ফেলে পালিশ করে নেয়া হয়েছে। 'হ্যালো, মিস্টার কুপার। এনথনি ট্র্যাভেল লিমিটেড থেকে বলছি। আপনার পরিকল্পনার কথা আমাদের জরুরী বিভাগকে জানানো হয়েছে।' থামলো মেয়েটা। তারপর বললো, 'কাজটা ঠিকই করেছি, তাই না? নিরাপদ ভ্রমণই তো চান আপনি, পালিয়ে যেতে চান কোলাহল আর লোকের ভিড় থেকে।'

তিন

'হ্যাঁ, চাই,' কণ্ঠে উত্তেজনা ফুটতে দিলো না রেজা। 'আর আপনাদের নিরাপদ ভ্রমণ সম্পর্কেও আরও ভালো মতো জানতে চাই।' ফোনের সঙ্গে লাগানো সুইচ অন করে দেয়ার ইশারা করলো ডনসিকে।

'আমরা জানি,' বলে গেল ওপাশের কণ্ঠ, 'নিরাপদ ভ্রমণে যারা যেতে চায় তাদের সময় খুব কম। খুব চাপের মধ্যে থাকে তারা। শুনে খুশি হবেন, আপনার রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনাকে সেটা জানাতেই ফোন করলাম। এর বেশি কিছু আপাতত জানার দরকার নেই আপনার। তবে হ্যাঁ, পেমেন্টের কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাই। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।"

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'আগের বার যখন কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে, তখনই বলেছিলাম, আমাদের ক্লাবের ফি পঁচাত্তর হাজার ডলার। একশো

ডলারের চেয়ে বড় নোট নেবো না,' মসৃণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছে মেয়েটা। 'আর, চেক এবং ক্রেডিট কার্ডে যে চলবে না সে তো বুঝতেই পারছেন।'

'পারছি। এখন দয়া করে বলুন, কি কি করতে হবে আমাকে, কোথায় যেতে হবে।'

'লোক মারফত দক্ষিণ ফ্লোরিডার একটা ম্যাপ পাঠাবো আপনার কাছে। তাতে সৈকতে একটা চিহ্ন দেখতে পাবেন। সেখানেই কাল বিকেলে আপনার সঙ্গে দেখা করবে আমাদের লোক, যদি আপনার কোনো অসুবিধে না থাকে।'

'নেই। যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভালো।'

'আমাদের সব মক্কেলেরই তাড়া থাকে,' মেয়েটা বললো। 'আরেকটা কথা। আপনার নাম কি হবে?'

'নাম?'

'আমাদের নিরাপদ ভ্রমণে মানুষকে তার পুরনো পরিচয় ত্যাগ করে যেতে হয়। এমনকি নাম পর্যন্ত। যে মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, আপনার অতীতের কোনো কথা জানতে চাইবো না আমরা। এমনকি নামও জিজ্ঞেস করবো না। তবে ডাকার জন্যে একটা কিছু তো দরকার। এই টেলিফোনের পর আপনার সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত রেকর্ডও মুছে যাবে আমাদের ফাইল থেকে।'

'বুঝেছি। কিছুই কারও জানা না থাকলে গায়েব হয়ে যাওয়ার সুবিধে।'

'ঠিক ধরেছেন। এখন দয়া করে নামটা যদি বলেন...'

'রেজা হলে কেমন হয় ? নামটা ভালোই, কি বলেন ?'

'চলবে। মোট কথা ডাকার মতো কিছু একটা হলেই হলো। আচ্ছা, রাখি…'

'ও হ্যাঁ, শুনুন শুনুন, আরেকটা কথা,' রেজা বললো।

'কি ?'

'আমার একজন সঙ্গী আছে। সে-ও নিরাপদ ভ্রমণে আগ্রহী। মানে, খুবই আগ্রহী। তাকে কি সঙ্গে নিতে পারবো ?'

'প্লীজ, ধরুন, আমার সুপারভাইজারের সঙ্গে আলাপ করে দেখি।' কিছুক্ষণ পর আবার কথা বললো মেয়েটা, 'হ্যাঁ, তারও জায়গা করা যাবে। তবে টাকা লাগবে। পঁচাত্তর। তারমানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার। আর ভুলে যাবেন না, একশো ডলারের চেয়ে বড় নোট চলবে না কিছুতেই।'

'কোনো কনসেশন নেই ?' রেজা জিজ্ঞেস করলো। 'দু'জন আসছি একসাথে, আমি ভাবছিলাম…'

'ধরুন, দেখি।' আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর কথা বললো মেয়েটা, 'হ্যাঁ, কনসেশন আছে। পঁচিশ হাজার। দু'জনের জন্যে এক লাখ পঁচিশ হলেই চলবে।'

'খুব ভালো।'

'আপনার সঙ্গীর নাম কি ?'

'আসল নাম না নতুন নাম ?'

'অবশ্যই নতুন।'

'ধরুন, সুজা। সহজ নাম, মনে রাখতে সুবিধে।'

'বেশ, সুজাই তাহলে। আর কিছু বলবেন ?'

'একটা কথা। কি ধরনের কাপড় পরবো আমরা ?'

'যতোটা সম্ভব শাদাসিধে কাপড় পরারই চেষ্টা করবেন। আর মালপত্র বেশি আনার দরকার নেই। নিরাপদ ভ্রমণে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাবেন।'

'ফি যা দেবো তার মধ্যেই ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো।'

'মক্কেলের সুখসুবিধার দিকে কড়া নজর আমাদের। একজন সন্তুষ্ট হলে আরও চারজনকে বলবে, সেটা আমাদের লাভ। আপনিও তো ওভাবেই খবরটা পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ অপনাকে।'

'থ্যাংক ইউ। আপনার নিরাপদ ভ্রমণ নিরাপদ হোক।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভারটা ধরে রেখেই চিন্তিত ভঙ্গিতে ডেস্কের ওপর রাখা স্পীকারের দিকে তাকিয়ে রইলো রেজা।

'তারমানে ফ্লোরিডা রওনা হচ্ছি আমরা,' সুজা বললো। 'চমৎকার। বাড়ি গিয়ে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিই। এই নিরাপদ ভ্রমণের একেবারে গোড়া দেখে ছাড়বো।'

'আস্তে, আস্তে,' হাত তুললো রেজা, 'এতো তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। ফ্লোরিডায় যাবার পথটা খোলা রাখলাম, যাতে দরকার পড়লে যেতে পারি। না গিয়ে এখন পুলিশকেও জানাতে পারি আমরা।' ডবসির দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করলো সে। 'ডবসি, বলতে

খারাপই লাগছে আমার, তোমার বাবার ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না। বোঝাই যাচ্ছে অ্যারেস্ট হওয়ার আগে এই সংস্থাটার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি, পালানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া আলমারিতে ছিলো অ্যাটাচি কেস বোঝাই টাকা। একশো ডলা-রের নোট! পুলিশকে না জানানোটা হয়তো অন্যায় হয়ে যাবে। মিস্টার কুপারের বিরুদ্ধে এটা খুব জোরালো একটা প্রমাণ।

ডবসি রেগে উঠলো না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রেজা।

'বাবা কখনই পালাতে চায়নি,' শান্তকণ্ঠে বললো ডবসি। 'নিশ্চয় এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। তার মেয়ে বলেই যে একথা বলছি, তা নয়।'

'দাদা, অন্য উপায়টাই বোধহয় ভালো,' সুজা বললো। 'মানে পুলিশকে না জানিয়েও তো সব জানার আরেকটা পথ খোলাই রয়েছে আমাদের জন্যে। কিছু একটা ঘটছে, যা আমরা জানি না। কাজেই এখনি পুলিশকে না জানিয়ে ফ্লোরিডায় গিয়েই দেখি না, মিস্টার কুপার সত্যিই অপরাধী কিনা।'

গম্ভীর হয়ে আছে রেজা। 'তোদের কেমন লাগছে বুঝতে পারছি। কিন্তু সত্য...'

'ঠিক,' রেজার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো সুজা. 'সত্য। আর সেই সত্যটা জানার জন্যেই ফ্লোরিডায় যেতে হচ্ছে আমা-দের।'

'রেজা,' অনুনয় করলো ডবসি, 'তোমরাই শুধু এখন বাবাকে সাহায্য করতে পারো।'

শ্রাগ করলো রেজা। 'বেশ, যাবো। দুটো কারণে। প্রথমত, তোমার বাবাকে অপরাধী ভাবতে পারছি না। দ্বিতীয়ত, মিস্টার হেসও নিরাপদ ভ্রমণে গিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন কিনা জানার জন্যে।'

ডবসির দিকে তাকিয়ে হাসলো সুজা। 'আমার ভাইকে তো আমি চিনি, শুরু থেকেই সে জানে, যাবে। এরকম একটা রহস্য পেয়ে ছেড়ে দেবে রেজা মুরাদ, ভাবাই যায় না।'

'একটা জিনিস বোঝা দরকার,' সুজার কথায় কান দিলো না রেজা। 'তোমাকেই বলছি, ডবসি, যদি জানা যায় তোমার বাবা সত্যিই অপরাধী, তাহলে পুলিশকে সব বলে দেবো আমরা। কোনো তথ্য ধামাচাপা দেয়ার অনুরোধ করতে পারবে না তখন আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকালো ডবসি। 'বুঝতে পেরেছি। তবে আমি শিওর, বাবা ওরকম অন্যায় করতেই পারে না।'

'তাহলে তো কোনো কথাই নেই,' সুজা বললো। 'যাকগে। টাকাগুলো পেয়ে সুবিধে হলো আমাদের। নিরাপদ ভ্রমণের ভাড়া দিতে অসুবিধে হবে না। প্লেনের টিকেটও কিনতে পারবো।'

'টিকেটের ব্যবস্থা আমি করবো,' ডবসি বললো। 'ক্রেডিট কার্ড আছে। তোমাদের সঙ্গে আমিও যেতাম, কিন্তু বাবার কাছাকাছি থাকতে হবে এখন আমাকে। আশা করি তোমরা দু'জনেই যা করার করতে পারবে।'

ডিরেকটরির পাতা ওল্টাতে শুরু করেছে ততোক্ষণে রেজা।

ফ্লোরিডায় যায় ওরকম একটা এয়ারলাইনের নম্বর খুঁজে বের করলো। 'টিকেট পেতে হলে এখন কপাল দরকার। এই ক্রিসমাসের সময় সব সীট বুক হয়ে আছে নিশ্চয়।'

'ফার্স্ট ক্লাসে যাও,' ডবসি বললো। 'সীটের অভাব হবে না। দরকার হলে প্লেন ভাড়া করে নিয়ে চলে যাও।'

'টাকা,' অ্যাটাচি কেসটা তুলে নিতে নিতে বললো সুজা, 'একটা অতি চমৎকার জিনিস।'

গাড়িতে বসে আগের দিনের এসব কথা মনে পড়ছে দু'জনের। কোথায় চলেছে ওরা বোঝার উপায় নেই। টাকাই সব করতে পারে, এখন আর এ-ব্যাপারে অতোখানি শিওর হতে পারলো না সুজা।

দু'জনের মাঝখানে সীটের ওপর রাখা কেসটা। তাতে চাপড় দিয়ে বললো সে, 'দাদা, এই টাকা আমাদেরকে তো ঢোকালো বাঘের গুহায়, এখন দেখা যাক বের করে আনতে পারে কিনা।'

ইশারায় সুজাকে চুপ করতে বলে টেলিভিশনটা অন করে দিলো রেজা। ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে কাত হয়ে ভাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললো, 'সাবধানে কথা বলবি। ড্রাইভার ব্যাটা নিশ্চয় শুনছে আমাদের কথা, মাইক্রোফোনের সাহায্যে। বোঝার জন্যে, আমরাই ঠিক লোক কিনা।'

মাথা ঝাঁকালো সুজা।

রেজা বললো, 'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দ্রুত ঘটছে ঘটনা।

আমি ভেবেছিলাম আরও অপেক্ষা করতে হবে। ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, প্ল্যান করার জন্যে আরও সময় নেবে। এই সুযোগে তথ্য জেনে নিয়ে ডবসিকে জানাবো, যাতে আমাদের কিছু হয়ে গেলে, বা বিপদে পড়লে পুলিশকে জানাতে পারে সে। তাহলে সাহায্য আসতো।'

'এখন আর আসবে না,' বিড়বিড় করলো সুজা। কেঁপে উঠলো একবার, এয়ারকণ্ডিশনিং-এর কারণে নয়। 'তবে ভাবনা কি। সাহায্য ছাড়াও কাজ করেছি আমরা আগে, আরও একবার করতে পারবো। অস্বস্তি লাগছে আরকি এই যা। লাগারই কথা। যা একখান গাড়ি, ঢোকার পর পরই মনে হয়েছে দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। কেমন জানি লাগে, না?'

'হ্যাঁ,' একমত হলো রেজা।

'আমরা কি করছি বাবাকে জানিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো।'

'তা হতো। জানাতে তো কাউকেই পারিনি, কি আর করা।'

ঘড়ি দেখলো সুজা। 'এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল গাড়িতে উঠেছি। আর কতোক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ না, যদি পানির তলায় নামতে না চায়। দক্ষিণে চলেছি আমরা। রওনা হওয়ার পর থেকে একবারও মোড় নেয়নি। তার-মানে ফ্লোরিডার এক প্রান্তে পৌঁছে গেছি। যদি ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে এসে না থাকি।'

'ছাড়িয়ে এসে না থাকি মানে?'

'হাইওয়ের শেষ মাথা থেকে শুরু হয়েছে এখানে কজওয়ে। ফ্লোরিডা কীজ থেকে শুরু করে কী ওয়েস্ট পর্যন্ত যতো ছোট ছোট দ্বীপ আছে সবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে।' এনথনি ট্র্যাভেলস-এর সরবরাহ করা ম্যাপ দেখায় মন দিলো রেজা।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল সুজা। 'এই, গাড়ি ঘুরছে!'

'এবং গতি কমছে,' বলে টেলিভিশনটা অফ করে দিলো রেজা। 'নিশ্চয় মেইন হাইওয়ে থেকে সরে এসেছে গাড়ি।'

ধীর গতিতে এগিয়েই চলছে গাড়ি। তারপর, মিনিট দশেক পর, থেমে গেল। ড্রাইভারের পাশের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল।

উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে দুই ভাই। কিন্তু পেছনের দরজার তালা খোলার আওয়াজ হলো না!

'খুলছে না কেন ব্যাটা?' সুজা বললো

'হয়তো বসের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কিংবা লোক নিয়ে আসবে।'

আরও তিন মিনিট পেরোলো।

অবশেষে খোলা হলো দরজা।

নোভার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটা লোক, মিলিটারি স্টাইলে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। পরনেও সামরিক পোশাক: কড়া ইস্তিরি করা সবুজ ফ্যাটিগ, চকচকে পালিশ করা বুট, হাতে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের এম-১৬ ইনফ্যানট্রি রাইফেল। তবে কাঁধে পদবীর চিহ্ন নেই, বুকেও লেখা নেই নাম। যে সেনাবাহিনীর

লোকই হোক সে, সেটা সরকারী নয়, প্রাইভেট।

সুজার দিকে তাকালো রেজা।

সুজা তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। রেজার মতোই সে ও বুঝতে পেরেছে ওই লোক বেসরকারী কোনো বাহিনীর।

'নামুন, প্লীজ,' রেজা সুজাকে বললো ড্রাইভার। 'হফারের সঙ্গে যান।' লোকটাকে দেখালো সে।

বেরিয়ে এলো দুই ভাই। সামনে বিশাল এক অট্টালিকা, শাদা শাদা স্তম্ভ, দক্ষিণাঞ্চলের প্রাচীন কাহিনী নিয়ে তৈরি সিনেমার পর্দা থেকে নেমে এসে যেন শুধু বসে গেছে। আশপাশের এলাকাও ওরকম, শুধু একটা জিনিসে মিল নেই সিনেমার সঙ্গে। বাড়ির আশপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গরান গাছের জঙ্গলের ওপাশে কাঁটাতারের উঁচু বেড়া।

রাইফেল নেড়ে হফার বললো, 'চলুন। এখানে দেখার কিছু নেই, আর দেখেও লাভ হবে না। এখানে থাকছেন না আপনারা।'

নোভার হাতে আবার পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। হফারের কথার পিঠে যেন লোভ সামলাতে না পেরেই বলে ফেললো, 'ও ঠিকই বলেছে। এখানে থাকছেন না আপনারা, যদি নকল পরিচয়ে না এসে থাকেন।' হাসলো, যেন খুব উপভোগ করছে রেজা সুজার অসহায় অবস্থা। 'তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটাই আপনাদের জীবনের শেষ ঠিকানা।' কুৎসিত হলো হাসিটা। 'শেষ এবং চিরস্থায়ী।'

চার

কলিং বেলের বোতাম টিপলো হফার। দরজা খুলে দিলো তার মতো পোশাক পরা আরেকজন। ওর হাতেও এম-১৬। হাত নেড়ে ভেতরে ঢোকার ইশারা করলো রেজা সুজাকে।

ভেতরটা অবাক করার মতো। বাড়ির বাইরে থেকে মনে হয় প্রাচীন, ভেতরটা ঠিক উল্টো, পুরোপুরি আধুনিক। আলোকিত, কিন্তু কোথা থেকে আলো আসছে ঠিক বোঝা যায় না। দেয়ালে মনোরম হালকা রঙ। কার্পেট এতো পুরু, পায়ের প্রায় গোড়ালি অবধি দেবে যায়। অত্যাধুনিক আসবাবপত্র, ছিমছাম, চকচকে। অত্যন্ত দামী কোনো হোটেলের কামরা যেন।

পথ দেখিয়ে আরেকটা ঘরে দুই ভাইকে নিয়ে এলো হফার। ওটা অফিস। ডেস্কের ওপাশে বসে আছে এক সুন্দরী তরুণী। ডেস্কের ওপরে একটা কমপিউটার।

হাসিমুখে ওদের দিকে তাকালো মেয়েটা। হাসি মুছে গেল সঙ্গে

সঙ্গে। সে আশা করেছিলো মাঝবয়েসী দু'জন লোক আসবে, সেই জায়গায় দুই তরুণকে দেখে বিস্ময় ফুটলো চোখে। মুহূর্ত পরেই অবশ্য আবার ফিরে এলো হাসিটা। 'হাই, আমি মলি।' শীতল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'আপনাদের নামটা যদি বলেন, চেক করে নিতে পারি।'

কণ্ঠস্বরেই মেয়েটাকে চিনতে পারলো রেজা, এই মেয়ের সঙ্গেই আগের দিন ফোনে কথা হয়েছে।

'হাই,' জবাব দিলো সে। 'বোধহয় আগেও কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে। আমি রেজা। আর ও সুজা।'

'রেজা এবং সুজা,' দু'জনের ওপর চোখ বোলালো মেয়েটা। চোখে সন্দেহ। খটাখট কমপিউটারের চাবি টিপলো, তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। কি লেখা ফুটেছে দেখতে পেলো না দুই ভাই। মলি বললো, 'যাক, সময়মতোই হাজির হয়েছেন। মক্কেলরা নির্দেশ মেনে চললে কাজ করা খুব সহজ হয়। এক লাখ পঁচিশ হাজার ডলার, প্লীজ।'

কেসটা টেবিলে রেখে ডালা খুললো রেজা। 'আমি গুনবো, না আপনি?'

'আমিই গুনি।'

প্রথম বাণ্ডিলটা তুলে নিয়েই বদলে গেল চেহারার ভাব। দূর হয়ে গেল হাসিতে মেশানো সন্দেহ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উল্টেপাল্টে দেখলো একবার বাণ্ডিলটা, তারপর নোটগুলোতে যেন উড়ে চললো আঙুল। গোনা শেষ করে কয়েকটা নোট খুলে নিয়ে আলাদা করে

রাখলো। ড্রয়ার থেকে পেনলাইট আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে একে একে পরীক্ষা করতে শুরু করলো ওগুলো।

'কি ব্যাপার, আমাদের বিশ্বাস করছেন না?' বলে উঠলো রেজা। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। ভাবছে, ইস্, বোকামি হয়ে গেছে। আগেই পরীক্ষা করে নেয়া উচিত ছিলো। জাল নয় তো?

'রুটিন চেক, বলা তো যায় না,' মুখ না তুলে বললো মেয়েটা। কেস থেকে আরেকটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে গুনলো, পরীক্ষা করলো।

চুপ করে আছে রেজা সুজা। নীরব ঘরটায় মাঝে মাঝে টাকা গোনার খসখস ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। পেছনে কাশি দিয়ে হঠাৎ গলা পরিষ্কার করলো হুফার। ফিরে তাকানোর দরকার মনে করলো না দুই ভাই। কল্পনায়ই দেখতে পাচ্ছে ওর হাতের এম-১৬। গুলি করার জন্যে যে তৈরি রেখেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশেষে মুখ তুললো মলি। সামনে ডেস্কে সুন্দর করে সাজিয়েছে নোটের বাণ্ডিলগুলো। ফিরে এসেছে মোলায়েম হাসি। চোখেও সন্দেহ নেই আর এখন, হাসিতেও নেই।

'মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে,' বললো সে। 'তো, এখন বাকি টাকা কি করতে চান? অনেক বেঁচে গেছে।' কেসের অবশিষ্ট টাকাগুলো দেখালো। এখনও চার ভাগের তিন ভাগ পূর্ণ রয়েছে। 'আমাদের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে চান? নাকি নিজের কাছে রাখবেন?'

'আমাদের কাছেই রাখি,' রেজা বললো।

'আমিও সেটাই আশা করেছি। আমাদের সব মক্কেলই তাঁদের টাকা নিজের কাছে রাখতে চান। সবাই খুব আত্মকেন্দ্রিক। কোনো মতে বেঁচে ফিরে আসে তো, পলাতক বলি আমরা ওদেরকে।'

'আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে উপায় কি? দুনিয়াটা যেরকম নিষ্ঠুর।' তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করলো রেজা, 'সে-জন্যেই তো আমাদের এই পালিয়ে আসা। আপনাদের আর সব মক্কেলের মতো, তাই না?'

ফাঁদে পা দিলো না মলি। হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হলো শুধু। বললো, 'হফার আপনাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। একটা ঘরই ব্যবহার করতে হবে দু'জনকে, কিছু মনে করবেন না, কনসেশন রেট দিয়েছেন তো। পঁচিশ হাজার কম না। তবে যদি বেশি দিতে চান, এখনও...'

'এক ঘরেই চলবে আমাদের,' রেজা বললো।

'বেশ। আশা করি আমাদের আতিথ্য আপনাদের ভালো লাগবে।' কট করে কেসের তালা লাগিয়ে ওটা ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো মলি। মেয়েটার যান্ত্রিক কথাবার্তা আর মোলায়েম হাসি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো সুজার। কষে একটা চড় মারার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করলো।

কেসটা তুলে নিতে নিতে আরেকবার শেষ চেষ্টা করলো রেজা, 'আশা করি বেশিদিন থাকতে হবে না আমাদের: যতো তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারি...'

'সময় হলেই যাবেন। কিছু নিয়ম কানুন আছে। ভয় নেই,

এখানে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না আপনাদের। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। খুব কড়া ব্যবস্থা আমাদের।'

'হ্যাঁ,' আর কথা না বলে পারলো না সুজা, 'সেটা দেখেই এসেছি, কাঁটাতারের বেড়া। একটুও পছন্দ হয়নি আমার। জেলখানায় এনে ভরা হয়েছে যেন।'

'আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেই,' সামান্যতম মলিন হলো না মলির হাসি। 'হুফার, মেহমানদেরকে তাদের ঘরে দিয়ে এসো।'

'চলুন,' কর্কশ কণ্ঠে বললো হুফার। মলির ভদ্রতার ছিটেফোঁটাও নেই তার মধ্যে। 'ইন্টারভিউর আগে আধ ঘণ্টা সময় পাবেন।'

'ইন্টারভিউ?' জানতে চাইলো রেজা।

'কিসের ইন্টারভিউ?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

বন্দুকের নল নেড়ে সমস্ত জিজ্ঞাসার ইতি করে দিলো হুফার।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নিয়ে এলো ওদেরকে, একটা হলঘরের পাশের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। 'যান, আরাম করুন গিয়ে। আধ ঘণ্টা পরেই ফিরে আসছি আমি।'

ঘরে ঢুকলো রেজা সুজা। বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়া হলো দরজায়। অবাক হলো না ওরা। ইতিমধ্যেই আঁচ করে ফেলেছে, ওদেরকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না।

ভেতরে ঢুকেই ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করলো রেজা। তারপর টোকা দিলো নিজের কানে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো সুজা। রেজা বলতে চাইছে, ঘরে বাগ লুকানো থাকতে পারে।

'আরি, দারুণ জায়গা তো,' জোরে জোরে বললো সুজা, ভাই-য়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো। খুঁজতে শুরু করলো বাগটা। ছবির তলায়, আসবাবপত্রের ফাঁকফোকরে, ফুলদানীর ভেতরে, কার্পেটের নিচে।

'টাকা যেমন নিয়েছে,' রেজা বললো, 'সার্ভিসও দিচ্ছে এনথনি ট্র্যাভেল।' সে-ও খুঁজছে যন্ত্রটা।

পেলো না ওটা।

কিন্তু রেজার দৃঢ় বিশ্বাস, আছেই কোথাও না কোথাও। সারা ঘরে চোখ বোলাতে লাগলো আবার, দেখছে খোঁজা বাদ দিয়েছে কোন জায়গায়। ছাতের দিকে তাকাতে চোখ পড়লো পুরনো ধাঁচের ঝাড়বাতিটার ওপর। সুজাও ওটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো।

'খানিক ব্যায়াম দরকার,' রেজা বললো। 'গাড়িতে বসে থেকে থেকে খিচ ধরে গেছে শরীরে।'

'ভালো বলেছো,' সুজা বললো, 'আমারও।'

একটা চেয়ার এনে ঝাড়বাতিটার নিচে রাখলো রেজা। চেয়ারে উঠে বসে মাথা কাত করলো সুজার দিকে তাকিয়ে। ইঙ্গিত বুঝতে পারলো সুজা। ভাইয়ের কাঁধে চড়লো। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো রেজা। সুজার কাজ আরও কঠিন, কাঁধের ওপর দাঁড়ানো। তবে এসব কাজের প্র্যাকটিস আছে ওদের। ভারসাম্য বজায় রেখে উঠে দাঁড়ালো সে। নাগাল পেলো বাতিটার। উঁকি দিতেই চোখে পড়লো কালো রিসিভিং ডিভাইস।

লাফ দিয়ে কার্পেটে নামলো সুজা। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো।

'গোসল করতে হবে,' বলে, বাথরুমে চললো রেজা। পেছন পেছন এলো সুজা।

শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললো রেজা, 'বাহ্, ভালো জিনিস তো, পানির জোর আছে। এই, শাওয়ারটাও ভালো।' এমনভাবে বললো, যেন সুজা এখনও ওঘরে রয়েছে।

তারপর আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে পুরো ছেড়ে দিলো শাওয়ার। পানি পড়ার বেশ জোরালো শব্দ হচ্ছে। ভাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'আস্তে বলবি। মনে হয় না এখানে বাগ লুকিয়েছে। লুকালেও আস্তে বললে পানির শব্দের জন্যে শুনতে পাবে না।'

'ডবসির বাবার কপাল খারাপই মনে হচ্ছে,' সুজা বললো। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অপরাধীদের লুকিয়ে নিরাপদ জায়গায় পার করে দেয়ার ব্যবসা করে এনথনি কোম্পানি।'

'হ্যাঁ। হয়তো আরও কিছু করে। শুধু লোক পাচারের ব্যবসা নয়, আরও বড় কিছু। থাক, ওই ব্যাপারে পরেও ভাবা যাবে। এখন নিজেদের কথা ভাবা দরকার। ওদের বোঝানো দরকার, আমরাও ওদেরই মতো অপরাধী, নইলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, একটা গল্প বানাতে হবে,' সুজা বললো। 'আর সে-জন্যেই ব্যাটারা এখানে এনে ভরেছে আমাদের। ভেবেছে, গল্প বানানোর

চেষ্টা করবো আমরা, আলোচনা করবো এখানে, আর বাগের সাহায্যে সব শুনে ফেলবে ওরা।'

'ঠিকই আন্দাজ করেছিস।'

'তো, এখন গল্পটা কি বলবো? এতো টাকা কোথায় পেলাম আমরা? পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালালামই বা কিভাবে?'

'ওরা আশা করছিলো ডবলির বাবাকে,' রেজা বললো। 'কাজেই টাকা মেরে দেয়ার গল্পটাই বলবো ওদের।'

'বললেই বিশ্বাস করবে?'

'করবে। আমরা বলবো, টাকাটা বের করতে সাহায্য করেছিলাম আমরা মিস্টার কুপারকে। এই সময় এসে পুলিশ তাঁকে ধরলো। সুযোগ বুঝে ব্যাগ নিয়ে হাওয়া হয়ে গেলাম আমরা।'

হাসি ফুটলো সুজার মুখে।

শাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুললো রেজা। ঘরে বসা সুজাকে যেন ডেকে বললো, 'এই সুজা, বাথরুমটা সত্যি চমৎকার।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সুজা বললো, 'বেশি দেরি করে ফেলেছো। এতোক্ষণ কি করছিলে ওখানে? আর কয়েক মিনিট পরেই ইন্টারভিউ। আল্লাহই জানে কি জিজ্ঞেস করবে। আমার ভাল্লাগছে না এসব। এদেশ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। কখন এসে ক্যাঁক করে টুঁটি টিপে ধরবে পুলিশ, ঠিক আছে কিছু?'

'কিন্তু কি জানতে চায় ওরা?' রেজা বললো। 'টাকা চেয়েছে, দিয়েছি, ব্যস। আর কি?'

'ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। সতর্ক তো থাকবেই। এরকম

একটা ব্যবসা করছে, লোককে সন্দেহ না করলে লাটে উঠতো কবেই।'

মিনিটখানেক পর দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো হুফার, দরজায় টোকা দেয়ার সৌজন্যটুকুও দেখালো না। সোজা ঢুকে পড়লো। ওদেরকে বেরোতে বললো।

'এক সেকেণ্ড,' রেজা বললো। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলো অ্যাটাচি কেসটা। 'এটা আমাদের সঙ্গে থাকাই ভালো।'

অধৈর্য হয়ে বললো হুফার, 'চলুন, চলুন, জলদি করুন।'

একটা হলঘরের ভেতর দিয়ে আরেকটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো হুফার। দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে বললো, 'এই যে, স্যার, আরও দু'জনকে নিয়ে এসেছি।' রেজা সুজার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো ভেতরে ঢোকার জন্যে।

ওরা ঘরে ঢুকতেই পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সামনে বসে আছে খাটো, মোটা, টাকমাথা, গোঁফওয়ালা এক লোক। তার পরনেও সেনাবাহিনীর পোশাক। কাঁধে পদমর্যাদার চিহ্ন না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না এই লোক অফিসার। ডেস্কের পেছনের চেয়ারে নয়, লোকটা বসে আছে ডেস্কের ওপর। পা ঝুলিয়ে। একপায়ের চকচকে বুটের গোড়ালি ধীরে ধীরে ঠুকছে ডেস্কের সামনের কাঠে।

'তাহলে তোমরা রেজা আর সুজা,' বললো সে।

'হ্যাঁ,' রেজা বললো।

'তুমি কে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো সুজা। পাত্তাই দিতে

চাইলো না লোকটাকে ।

হাসলো লোকটা। 'লেমিল বলে ডাকতে পারো।'

'খুশি হলাম, লেমিল,' নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত বাড়ালো সুজা, কথাটাও বললো অনেকটা টিটকারির সুরে, ওরা যে জাত অপরাধী সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যেন। 'তা কতো তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বের করে দিতে পারবে ?'

'আজকালকার ছেলেছোকরাদের নিয়ে এই এক যন্ত্রণা,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো লেমিল, এড়িয়ে গেল সুজার বাড়ানো হাতটা, 'সব কিছুতেই খালি তাড়াহুড়া। যাই হোক, তোমাদের বয়েস একেবারেই কম, আমাদের সাহায্য নেয়ার কথা নয়। তাছাড়া যা খরচ, সেটা জোগাড় করতে পারার কথাও নয় ।'

রেজা বুঝতে পারলো, লোকটার সন্দেহ দূর করতে হলে কড়া কথা বলতে হবে। বললো, 'দেখো, কোনটা পারবো আর কোনটা পারবো না সেটা বোঝার দরকার নেই তোমার। পেরেছি, ব্যস এটুকুই জেনে রাখো। ফোনে ওই মেয়েটা বলছিলো, আমাদের অতীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে না।'

হাসলো লেমিল। 'ব্যবসা টিকবে না, যদি ছদ্মবেশী পুলিশের লোককে আমাদের গোপন রেলে বেড়াতে দিই। নাকি বলো ?'

'শুরু থেকেই মিথ্যে কথা,' গম্ভীর হয়ে সুজা বললো। 'তোমাদের বিশ্বাস করবো কিভাবে ?'

'বয়েস কম হলেও বোকা নও তুমি,' লেমিল বললো। 'এই পৃথিবীতে কাকেই বা বিশ্বাস করা যায় বলো ? কাউকে না। তবে

একটা কথা জেনে রাখো, তোমাদের ব্যাপারে যখন আর কোনো সন্দেহ থাকবে না আমাদের, আর বিরক্ত করা হবে না। লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি আমরা এটা প্রচার হলে ব্যবসা নষ্ট হবে আমাদের, কাজেই খারাপ কিছু করবো না। নতুন নামে নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়ে নতুন ভাবে বাস করার সুযোগ করে দেয়া হবে।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'বুঝলাম। ও-কে। বলছি সব কথা। ডবসি কুপার আমাদের বন্ধু। এক পার্টিতে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের। কুপারের সঙ্গে কমপিউটার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বলছিলাম, কমপিউটারকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে...'

'কোটি কোটি টাকা মেরে দেয়া যায়,' রেজার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো সুজা। 'কুপার বললো, এটা কখনো সম্ভব না। বললাম, আমরা দেখিয়ে দিতে পারি। তার বাড়ির কমপিউটারেই দেখিয়ে দিলাম, কাজটা করা সম্ভব।' হাসলো সুজা।

'হুঁ, শুনতে ভালোই লাগছে,' লেমিল বললো। 'কিন্তু এটা করেই দৌড়াতে শুরু করলে?'

'অনেকটা তাই,' শান্তকণ্ঠে বললো রেজা। 'কুপারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে লেগে গেলাম। রাতের বেলা অফিসের কমপিউটারে ভুয়া অর্ডার ঢুকিয়ে রাখতাম, দিনে টাকা বের করে নিয়ে আসতাম। এরকম করে করে মোটা টাকা খসিয়ে নিলাম কোম্পানি থেকে। ভালোই চলছিলো, কিন্তু শেষে লোভ বেড়ে গেল কুপারের, অসতর্ক হয়ে পড়লো। মনে করলো, কিছু তো হয়ই না, ধরা-টরা পড়ে না। এবং একারণেই ধরাটা পড়লো। শেষ পেমেন্টটা

সবে তুলে নিয়েছি আমরা, এই সময় পুলিশ ঢুকলো, কুপারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পালালাম। কুপার তোমাদের সঙ্গে আগেই সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলো, মোটামুটি জানতাম। ও জেলে যাবার পর তোমরা যখন ফোন করলে, হাতে যেন স্বর্গ পেলাম।'

লেমিলের দিকে তাকিয়ে হাসলো রেজা, তারপর সুজার দিকে তাকিয়ে।

'হুঁম্‌ম্‌,' মাথা দোলালো লেমিল। 'রেজা আর সুজা, মনে হচ্ছে তোমাদের '

এই সময় বাজলো টেলিফোন। রিসিভার তুলে নিয়ে নীরবে শুনলো লেমিল। সরু হয়ে এলো চোখের পাতা। 'থ্যাংকস। দেখছি কি করা যায়।'

দুই ভাইয়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলো সে। ডেস্ক থেকে নেমে গিয়ে ড্রয়ার খুললো। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো রেজা সুজা, তাকালো পরস্পরের দিকে। হঠাৎ করে লেমিলের ভাবসাব বদলে গেল কেন? ড্রয়ারের ওপর ঝুঁকে আছে সে, আবার যখন সোজা হলো তার হাতে দেখা গেল একটা '৪৫ অটোম্যাটিক। ধীরে ধীরে উদ্যত হলো ওদের দিকে।

'একটা কথা বলোনি তোমরা রেজা সুজা,' ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়লো লেমিলের মুখে,'পুরো নামটা। হয়তো ভুলে গিয়েছিলে। আর বাবার নামটাও গোপন করেছো। বিখ্যাত গোয়েন্দা ফিরোজ মুরাদ। তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

পাঁচ

'বিখ্যাত গোয়েন্দা ফিরোজ মুরাদ!' অবাক হলো সুজা। সে মনে করেছে, টোকা দিয়ে ওদেরকে যাচাই করে নিতে চাইছে লেমিল। 'কে লোকটা?'

'তার নাম না শোনার কথা নয় তোমাদের,' লেমিল বললো। 'তোমাদের বয়েসী দুটো ছেলে আছে তার, নাম রেজা মুরাদ আর সুজা মুরাদ। বাপের মতোই গোয়েন্দা হওয়ার খুব সাধ ওদের।'

'তাই নাকি? দারুণ তো,' রেজা বললো।

'যেটা খুশি হোক গিয়ে ওরা, তাতে আমাদের কি?' বললো সুজা।

দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলো হফার, একহাতে এম-১৬, আরেক হাতে একটা ম্যাগাজিন। বাড়িয়ে দিলো লেমিলের দিকে।

কভারটা দেখলো লেমিল। 'হুঁমম, অ্যাডভান্সড কমপিউটার

অ্যাবসট্র্যাক্টস। তাহলে সত্যি তোমরা কমপিউটার চালাতে পারো, জ্ঞান-টান ভালোই আছে।'

'সেটা তো আগেই বলেছি,' গলায় জোর নেই আর রেজার। ম্যাগাজিনটার দিকে তাকিয়ে মোচড় দিয়ে উঠেছে পেটের ভেতর।

'ম্যাগাজিনটা যে তোমাদের, কি করে জানলাম তা-ও কিন্তু জিজ্ঞেস করলে না,' হাসি মুছলো না লেমিলের মুখ থেকে। 'বুঝতে পারছি, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করছো না। ভালো করেই জানো অ্যাড্রেস লেবেলে নাম লেখা রয়েছে তোমার। ছোট্ট একটা ভুল, তাই না? খেয়াল করোনি। এতে দোষের কিছু নেই। দুনিয়ার সব চেয়ে বুদ্ধিমান মানুষটিও ভুল করে।'

কি জবাব দেবে? মিনমিন করে বললো রেজা, 'চুরি করে আমাদের ব্যাগ ঘেঁটেছো তোমরা।'

'আগে ভাবোনি বলে দুঃখ হচ্ছে এখন?' লেমিল বললো।

'তা কি করবে এখন আমাদের?' ভাইয়ের দিকে তাকাতে পারছে না রেজা।

'সেটা কি মুখ ফুটে বলতে হবে?' রেজার বুক বরাবর পিস্তল নিশানা করলো লেমিল।

লেমিলকে আনন্দ উপভোগ করতে দিলো না রেজা। বুঝতে দিলো না যে, ভয় পেয়েছে। চেহারা স্বাভাবিক রাখলো অনেক কষ্টে।

'রিল্যাক্স,' লেমিল বললো। 'অন্ধকার হওয়াতক আছো! তারপর আমাদের দু'জন লোকের সঙ্গে যাবে। বিশেষ ঘরে পৌঁছে

দেবে ওরা তোমাদেরকে। এই বাড়িটার মতো সুন্দর নয় ওটা। বলতে গেলে কিছুই নেই, শুধু মাথার ওপরে বালির ছাত ছাড়া। চোরাবালির ওই জায়গাটা খুঁজে পেয়ে খুব সুবিধে হয়েছে আমাদের। যাদেরকে চাই না, তাদেরকে পুরোপুরি গায়েব করে ফেলতে পারি। পুলিশ কিছুই খুঁজে পাবে না।'

হুফারকে আদেশ দিলো সে, 'নিয়ে যাও এদের।'

'মাটির নিচে?' জানতে চাইলো হুফার।

'হ্যাঁ,' বলে রেজার দিকে ফিরলো লেমিল। 'অ্যাটাচিটা এখানেই রেখে যাও। যেখানে যাচ্ছো, সেখানে এর কোনোই দরকার নেই।'

অস্ত্রের মুখে রেজা সুজাকে আবার নিচতলায় নামিয়ে আনলো হুফার। তারপর আরেক সারি সিঁড়ি পার করিয়ে নিয়ে এলো মাটির তলার একটা বারান্দায়। দু'পাশে দুই সারি কাঠের দরজা। ছাতে বেশ দূরে দূরে কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে, আলো খুব কম।

'মন খারাপ লাগছে, না?' হুফার বললো। 'লাগবেই। ওপরে এমন রাজকীয় ব্যবস্থা, আর এখানে এই গোলামের ঘর। আমার হলেও লাগতো। আসলে এগুলো গোলামের ঘরই, তৈরি করেছিলো পুরনো এক জমিদার। এখানে রেখে রেখে শাস্তি দিতো।'

বারান্দার শেষ মাথায় পৌঁছলো ওরা। সেঁতসেঁতে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে ওদেরকে বাধ্য করলো হুফার। 'পকেটে কি আছে বের করো,' কঠিন কণ্ঠে বললো। ওরা পকেটের জিনিস মেঝেতে রাখলে বললো সে, 'ওই দরজাটা খুলে ভেতরে যাও।'

ঢুকলো ওরা। বাইরে থেকে ছিটকানি তুলে দেয়ার আওয়াজ শুনলো।

'কি অন্ধকারগে বাবা!' সুজা বললো। 'কিছু আলো-টালো পেলে হতো।'

'গা সওয়া করে নাও,' দরজার বাইরে থেকে বললো হফার। 'চোরাবালির তলায় এরচে বেশি অন্ধকার।'

নীরব অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে কাটছে দীর্ঘ মিনিটগুলো।

কিছুক্ষণ পর ফিসফিসিয়ে বললো সুজা, 'ব্যাটা গেছে?'

'মনে হয়,' ফিসফিস করেই জবাব দিলো রেজা। তারপর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করে বললো, 'আস্তে বলার দরকার নেই। এখানে বাগ আছে বলে মনে হয় না।'

'এরপর আর তোমার কথায় ভরসা রাখতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না,' তিক্ত কণ্ঠে বললো সুজা।

'সুজা, সত্যি আমি দুঃখিত। খুব ভালো একটা আর্টিকেলের অর্ধেক পড়েছি, ভাবলাম, বাকিটাও পড়বো। তাই ব্যাগে ভরেছিলাম। তারপর এতো তাড়াতাড়ি সব কিছু ঘটতে শুরু করলো, ওটার কথা ভুলে গেলাম। পড়ার আর সময়ই পেলাম না।'

'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়িই চোরাবালির টিকেট কেটে দিলো ওটা আমাদের। থাকগে, এখন আর ভেবে লাভ নেই। বেরোনোর বুদ্ধি করা দরকার।'

আলো জ্বলে উঠলো তার হাতে।

'বাহ্, পেনলাইটটা রেখে দিয়েছিস তাহলে,' রেজা বললো।

'ভালো করেছিস। লুকিয়েছিলি কোথায়? তালুতে?'

'হ্যাঁ। তুমি কিছু লুকাওনি?'

'এটা।' সুইস ছুরিটা দেখালো রেজা।

'যন্ত্রপাতি ভালোই এনেছি তাহলে। কাজ করা যাবে।'

দরজার সামনে বসে পড়লো রেজা। পরীক্ষা করতে শুরু করলো। 'তালা নেই। বেরোতে হলে বাইরের ছিটকানি খুলতে হবে।'

ছুরির সব চেয়ে লম্বা ফলাটা দিয়ে দরজায় খোঁচা দিয়ে দেখলো সে। 'খুব নরম। সময় পেলে নখ দিয়ে খুঁচিয়েই ফুটো করে ফেলতে পারবো।'

'কিন্তু নেই। ছুরি দিয়েই কাটো।'

ছিটকানিটা যেখানে থাকার কথা, আন্দাজে ওখানে খোঁচাতে শুরু করলো রেজা। আলো ধরে রাখলো সুজা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট একটা ফুটো করে ফেললো। তারপর ছুরির খুদে করাতটা দিয়ে কেটে বড় করতে লাগলো ছিদ্রটা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল ছিটকানি।

লম্বা ফলাটা দিয়ে ছিটকানি খোলার চেষ্টা করতে লাগলো রেজা।

নড়লোও না ওটা।

কেটে ছিদ্রটা আরও বড় করতে শুরু করলো রেজা।

'জলদি করো,' তাগাদা দিলো সুজা। 'যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো রেজা। আবার চেষ্টা চালিয়ে গেল। বড় হলো ছিদ্র 'দেখা যাক, এবার খোলা যায় কিনা,' বললো সে।

ফুটোটায় দুটো আঙুল ঢুকিয়ে ছিটকানিটা ছুঁতে পারলো সে। মরচে পড়ে আছে, খসখসে, নড়তে চায় না একারণেই। অনেক চেষ্টার পর একটু যেন নড়লো মনে হলো।

'ইস্,' আঙুল ডলতে ডলতে বললো রেজা, 'একেবারে অবশ হয়ে গেছে।'

'দেখিতো আমি চেষ্টা করে,' এগিয়ে এলো সুজা।

জায়গা বদল করলো ওরা।

'হ্যাঁ, নড়ে,' সুজা বললো, 'তবে বেশি না। শক্ত হয়ে লেগে আছে।' কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সে-ও আঙুল বের করে ঝাড়তে আরম্ভ করলো।

আবার এগিয়ে এলো রেজা। তারপর আবার সুজা।

বার তিনেক এভাবে জায়গা বদল করার পর সুজা বললো, 'কাজ হয়ে গেছে।' বলেই ঠেলা দিয়ে পাল্লা খুলে ফেললো। 'বাঁচা গেল।'

'বাঁচলাম আর কোথায়?' রেজা বললো। 'মাত্র তো দরজা খুলেছি। এই জেলখানা থেকে বেরোনোর এখনও অনেক বাকি।'

দ্রুত বারান্দার শেষ মাথায় এসে সরু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো দু'জনে। আগে আগে চলেছে সুজা। বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তর সইছে না, কিন্তু সাবধান রয়েছে। সিঁড়ির মাঝামাঝি

এসে থেমে কান পাতলো। তারপর আবার উঠতে লাগলো। ওপরে উঠে আস্তে মাথা বের করে দেখে নিলো চারপাশটা।

'কেউ নেই,' ফিসফিসিয়ে বললো সে, 'এসো।'

উপরে উঠে খোলা দরজার দিকে দৌড় দিলো সুজা। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে রেজা।

একটা রিক্রিয়েশন রুমে এসে ঢুকলো ওরা। একটা পিং-পং টেবিল, একটা পুল টেবিল, একটা তাস খেলার টেবিল, ভিডিও গেম, বিশাল পর্দার একটা টেলিভিশন, একটা সফট-ড্রিংকের মেশিন, আর স্ন্যাক মেশিন আছে। তবে লোক নেই একজনও।

'ভালো সাজিয়েছে,' মন্তব্য করলো সুজা। সফট-ড্রিংক মেশিনের কাছে গিয়ে একটা বোতাম টিপলো। বেরিয়ে এলো একটা প্ল্যাস্টিকের কাপ, ভরে গেল কোমল পানীয়তে। 'বাহ্, দারুণ, পয়সা পর্যন্ত ঢোকাতে হয় না।' লম্বা চুমুক দিলো কাপে। 'রাজার হালে আছে ব্যাটারা।'

অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়লো রেজা। এরকম জরুরী পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভালো, তবে সুজা বেশি রেখে ফেলেছে।

'দেখ,' হুঁশিয়ার করলো সে, 'এতোক্ষণ পর্যন্ত কপাল ভালোই রয়েছে আমাদের। খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই বেরোনো দরকার।' হঠাৎ হাত তুললো, 'এই! কি হয়েছে...'

কথা শেষ হলো না তার। হাত থেকে কাপ ছেড়ে দিয়ে পুল টেবিল থেকে একটা বল তুলে নিলো সুজা, চোখের পলকে, ছুঁড়ে মারলো রেজার দিকে।

মাথা নিচু করারও সময় পেলো না রেজা। কানের পাশ দিয়ে শাঁ করে ছুটে গেল বলটা, থ্যাপ করে আঘাত হানলো। চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলো সে, দেখার জন্যে। কাটা কলাগাছের মতো পড়ে যাচ্ছে শাদা পোশাক পরা এক যুবক। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একই রকম পোশাক পরা আরেকজন, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে।

নড়ার সময় পেলো না দ্বিতীয় লোকটা। কারাতের কোপ মারলো রেজা। টুঁ শব্দ করলো না লোকটা, পড়ে গেল।

'ভালোই ছুঁড়েছি, কি বলো,' সুজা এগিয়ে এলো অচেতন লোকগুলোর কাছে। 'সেই আগস্টের পর আর এরকম ছুঁড়তে পারিনি।'

'মাথা যে এখনও গরম করে ফেলিসনি এতেই আমি খুশি,' রেজা বললো। 'ঠাণ্ডা থাকতে থাকতেই হঠাৎ আবার কখন চটে যাবি কে জানে। আমি তো ভেবেছিলাম আমাকেই ছুঁড়েছিস।'

'এতো তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে ঢুকলো, তোমাকে সাবধান করারই সময় পাইনি।'

'তাড়াতাড়ি এখন আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে,' বলে পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল রেজা। 'দাঁড়া। কাপড় বদলে নিই।'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকগুলোর কাপড় খুলতে বসলো সে।

'বুঝেছি,' বলে সুজাও তাকে সাহায্য করতে বসলো।

কয়েক মিনিটেই লোকগুলোর শাদা পোশাক পরে নিলো দুই

ভাই। ঠিক মাপমতো হয়নি, সামান্য বড়। কালো জুতোও খাপে খাপে লাগলো না পায়ে। নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে ফালি করে বাঁধলো লোক দু'জনকে। এখনও অচেতন ওরা।

'এবার বেরোনোর পথ খুঁজি চল,' রেজা বললো।

'ওই যে, ওখান দিয়ে,' বড় একটা জানালা দেখালো সুজা।

রাত হয়েছে বটে, কিন্তু আকাশে মস্ত গোল চাঁদ, মেঘের চিহ্নও নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ফলে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগোতে হলো ওদের।

'বেরোলাম তো, এবার?' সুজার প্রশ্ন। 'ওই কাঁটাতারের বেড়া ডিঙানো সহজ হবে না। আর আমার বিশ্বাস ওতে বিদ্যুৎ বইছে।' বাড়ির পাশ দিয়ে পেছনে এগোতে এগোতে বললো সে।

'জলদি,' ফিসফিসিয়ে বললো রেজা, 'শুয়ে পড়!'

সুজাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলো। ওদের কাছ থেকে পনেরো ফুট দূরে অ্যাসফল্টের পথ ধরে আসছে জনাবিশেক লোক।

একটু দূর দিয়ে পেরিয়ে গেল লোকগুলো, বাড়ির পেছনের একটা দরজা দিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকলো। আরও দুই মিনিট একইভাবে পড়ে থেকে তারপর উঠলো রেজা সুজা।

'এতোক্ষণ কেন নির্জন ছিলো বাড়িটা এখন বোঝা যাচ্ছে,' সুজা বললো। 'ওদিকে কোনো কারণে গিয়েছিলো। কেন গিয়েছিলো ভাবছি।'

'যেখানে খুশি যাক ওরা,' ফিসফিস করে বললো রেজা, 'আমা-

দের না খুঁজলেই আমি খুশি। চল, জলদি। আমরা পালিয়েছি বুঝতে দেরি হবে না ওদের, দল বেঁধে খুঁজতে আসবে তখন।'

'চলো, দেখি কতো তাড়াতাড়ি ছুটতে পারো,' এরকম বিপদের মুহূর্তেও রসিকতা ছাড়লো না সুজা। 'এখনও দু'শো ফুট পেছনে ফেলে দিতে পারি তোমাকে।'

'এগো,' বলেই ছুটতে শুরু করলো রেজা।

খোলা লন পেরিয়ে অ্যাসফল্টের রাস্তায় এসে উঠলো ওরা, রাস্তা ধরে দৌড়ে চললো। একজায়গায় পথটা যেখানে গাছের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, সেখানে এসে থামলো সুজা। দু'শো নয়, তিনশো ফুট পেছনে ফেলে এসেছে ভাইকে।

'দৌড়ানোই ভুলে গেছো তুমি,' রেজা কাছে এলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে।

'মোটেও না। তোর মতো খরগোশ নাকি আমি। একটানা পাঁচ মাইল ছোটো, তারপর দেখা যাবে কে হারে কে জেতে; খরগোশ, না কচ্ছপ।' পেছনে ফিরে তাকালো রেজা। কাউকে দেখা গেল না। তারমানে এখনও খোঁজ পড়েনি ওদের। সামনে কাঁটাতারের বেড়াও চোখে পড়লো না। এগিয়ে গেছে পথ। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এখান থেকে বলার উপায় নেই।

'আয়,' হাঁটতে শুরু করলো রেজা।

বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

'দেখো, দেখো!' থমকে দাঁড়িয়েছে সুজা। সামনের দৃশ্য দেখছে অবাক হয়ে।

একটা জেটিতে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা। তারপর সাগরের পানি স্থির, চাঁদের আলোয় লাগছে বিশাল এক চকচকে আয়নার মতো। জেটিতে বাঁধা রয়েছে একটা ইয়ট, এই বুনো পরিবেশে কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে ওটাকে।

'মনে হচ্ছে সাঁতরে আর সাগর পেরোতে হবে না,' আশা করলো সুজা। 'ওরকম একটা চমৎকার জলযান থাকতে কেনই বা পেরোবো?'

'দেখা দরকার,' রেজা বললো। 'লোকজন তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বলা যায় না, হয়তো হাইজ্যাক করারও সুযোগ পেয়ে যেতে পারি ওটাকে।'

'এরকম আশার বাণী শোনালে ভালোই লাগে,' চলতে শুরু করেছে ততোক্ষণে সুজা।

'এই, এতো তাড়াহুড়ো করিস না, সাবধানে যা,' জেটির কাছে পৌঁছে বললো রেজা। 'পুরনো জেটি। পা দিলেই ক্যাঁচম্যাচ শুরু করতে পারে।'

'আচ্ছা। তবে আর কোনো বিপদ দেখছি না···

সুজার মুখের কথা মুখেই রইলো। জ্বলে উঠলো উজ্জ্বল আলো। হঠাৎ যেমন জ্বললো, তেমনি হঠাৎ করেই নিভে গেল।

চাঁদের আলোয় আবার চোখ সইয়ে নিতে কয়েক সেকেণ্ড লাগলো ওদের।

এবং তারপরই মূর্তিটাকে দেখতে পেলো। শাদা ইয়টের মতোই শাদা পোশাক পরা ভূতুড়ে এক মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটার ডেকে।

তবে লোকটার কণ্ঠস্বরে ভুতুড়ে কিছু পাওয়া গেল না। নীরবতা খানখান করে দিলো তার কঠিন কণ্ঠ, 'এই, দাঁড়াও!'

পাথর হয়ে গেল যেন দুই ভাই। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো বোকা হয়ে। চাঁদের আলো তো নয়, মনে হচ্ছে যেন সার্চলাইটের তীব্র আলো।

ছয়

'এতোক্ষণে আসার সময় হলো,' আবার বললো লোকটা। 'আর পাঁচ মিনিট দেরি করলেই তোমাদেরকে ফেলে চলে যেতাম আমরা। মাল তোলা শেষ হয়েছে দশ মিনিট আগে, ভাটাও শুরু হয়েছে। আর থাকা যায় না।'

'ইয়ে···আমাদের বলতে দিন···,' বললো রেজা। দ্রুত একটা গল্প বানানোর চেষ্টা করছে মনে মনে।

'নিচে নামি আগে, তারপর শুনবো,' লোকটা বললো। 'তোমাদের মালপত্র কই?'

'মাল যারা তুলেছে তাদের একজনের কাছেই তো দিয়েছিলাম। আনেনি?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করলো লোকটা। 'দুটো গর্দভকে পাঠিয়েছে দেখছি এবার। না, আনেনি। গিয়ে যে খুঁজে আনবে তারও সময় নেই। থাক, চালিয়ে নেয়া যাবে। জাহাজে

অনেক ইউনিফর্ম আছে, মাপমতো নিয়ে নিতে পারবে। এসো, ওঠো এখন।'

'উঠছি,' নতুন এই খেলা পছন্দ করতে পারছে না সুজা, কিন্তু আর কিছু করারও নেই। 'ক'মিনিটই বা দেরি করলাম। বড় জোর মিনিট দুই। তাতেই এতো ধমকা-ধমকি!'

'নিয়ম খুব কড়াভাবে মেনে চলি আমরা, কক্ষনো ভুলবে না একথা,' ধমক দিয়ে বললো লোকটা।

'ঠিক আছে, স্যার,' বলে লাফ দিয়ে জেটি থেকে ইয়টের ডেকে উঠলো রেজা। তারপর উঠলো সুজা। আগে আগে চললো ওরা, পেছনে লোকটা।

হ্যাচওয়ের দিকে এগোতে গিয়ে আচমকা একটা দড়িতে পা বাধিয়ে আছাড় খেলো সুজা, ইচ্ছে করে। 'উফ্, গোড়ালিই ভেঙে গেছে বোধহয়! আলো জ্বেলে রাখেন না কেন?'

'আরে এ-তো দেখি গর্দভেরও গর্দভ,' লোকটা বললো। 'শেখাতেই জান খারাপ হবে আমার। অবশ্য এতো তাড়াহুড়োয় আর কি-ই বা আশা করতে পারি। আমারই কপাল খারাপ। আগের হারামজাদা দুটো, স্টুয়ার্ডের বাচ্চা স্টুয়ার্ডেরা আর খাবার খুঁজে পায়নি, পেলো কিনা পচা মাংস,' বিরক্তিতে নাক সিটকালো সে। 'এই, বলদ, আলো কেন নেই জানো? সিকিউরিটি। গোপনীয়তা। এবারের যাত্রাটা স্পেশাল যাত্রা। এমনকি রেডিও বাজানোও নিষেধ। কেউ যাতে আমাদের না দেখে, না শোনে কিছু। টর্চ জ্বালাও বারণ, তবু তোমাদের দেখার জন্যে জ্বালতে হয়েছে।'

হ্যাচওয়ে খুললো সে। ভেতর থেকে যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো উজ্জ্বল আলো। বোঝা গেল, বাইরের দিকের সমস্ত জানালা দরজা ভারি কিছু দিয়ে ঢেকে আলো নিরোধক করে দেয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি রেজা সুজাকে হ্যাচওয়ে দিয়ে নামিয়ে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়লো লোকটা, বন্ধ করে দিলো ঢাকনা। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলো নিচের ডেকে।

'এখানেই,' লোকটা বললো। বড় একটা কেবিনে ঢুকলো ওরা, কাঠের দেয়াল।

বিলাসিতার নমুনা দেখে শিস দিয়ে উঠলো সুজা।

বুঝতে পেরে লোকটা বললো, 'এটা কোটিপতির জাহাজ। এই কেবিনটা আমার। তোমাদেরটাও এর চেয়ে খুব একটা খারাপ না। চাকরি ভালো এখানকার। ঠিকঠাকমতো কাজ করো, হয়তো পাকাই হয়ে যাবে তোমাদের চাকরি।'

'আপনাকে কি নামে ডাকবো?' রেজা জানতে চাইলো।

'প্রতিষ্ঠান আমার নাম দিয়েছে ম্যাকগয়ার। সংক্ষেপে ম্যাক। তোমাদের?'

'এই জাহাজে আমি রেজা।'

'আর আমি সুজা।'

'রেজা। সুজা। সহজ। মনে থাকবে। আমার নামও নিশ্চয় তোমাদের মনে থাকবে।'

'থাকবে,' রেজা বললো।

'প্রথমে এখন তোমাদের খোলস ছাড়ানো দরকার,' ম্যাক

বললো। কেবিন থেকে বের করে এনে একটা বারান্দা ধরে ওদেরকে নিয়ে চললো সে। এই সময় চালু হলো ইয়টের এঞ্জিন। কাঁপুনিতেই বোঝা গেল চলতে আরম্ভ করেছে জাহাজ।

'এ-এক অদ্ভুত অবস্থা, বুঝেছো,' ম্যাক বললো। 'এটা আমার পঞ্চম যাত্রা, অথচ এখনও ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারিনি। কোথায় যাচ্ছি তা-ই জানি না, এ-কি ভালো লাগে? আমার অন্তত লাগে না। ওখানে গিয়ে নোঙর ফেলা হবে, জাহাজ থেকে নামতে পারবো না আমরা।' মাথা নাড়লো সে। 'যাকগে, মরুকগে, যা খুশি করুক ওরা। জানার চেষ্টা না করাই আমাদের জন্যে ভালো। প্রতিষ্ঠান জানাতে চাইলে তো জানাতোই।'

রেজা সুজাকে সাপ্লাই রুমে নিয়ে এলো ম্যাক। সেখানকার অ্যাটেনডেন্ট পোশাক সরবরাহ করলো দু'জনকে: কালো প্যান্ট, শাদা শার্ট, কালো টাই, শাদা জ্যাকেট, দুই জোড়া করে কালো জুতো—একজোড়া বাড়তি, কয়েক জোড়া মোজা, আণ্ডারওয়্যার, আর বাথরুমে ব্যবহারের সরঞ্জাম।

ওদের কেবিন দেখিয়ে দিলো ম্যাক।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দশ মিনিটের মধ্যে আমার কেবিনে দেখা করবে,' নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

দ্রুত কাপড় বদলে নিলো দু'জনে। রেজা বললো, 'মনে হচ্ছে জাহাজের ওয়েইটারের কাজ করিয়ে নেবে আমাদের দিয়ে।'

'ভালোই হবে,' সুজা বললো। 'ক্যাপ্টেনের কাছাকাছি যেতে পারবো। তার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে পারবো।

হয়তো জানা যাবে কোথায় চলেছি আমরা।'

'আরও অনেক কিছু জানার আছে আমার,' বললো রেজা। 'অনেক প্রশ্ন জমে রয়েছে মনে। এই নিরাপদ ভ্রমণের ব্যাপারটা শুধু নিরাপদে মানুষ পাচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আরও বড় কিছু রয়েছে। ধনী কিছু চোরকে সরিয়ে নেয়াটাই শুধু এদের উদ্দেশ্য নয়।'

টাইয়ের গিঁট বাঁধা শেষ করে আয়নায় তাকালো সুজা। 'কেমন লাগছে আমাকে?'

'জাত ওয়েইটার,' হাসলো রেজা। 'বাড়ি গিয়েও এই কাজই করবি এখন থেকে। টেবিলে আমার খাবার দেয়ার ভার তোকেই দিয়ে দিলাম। চল, ওদিকে নিশ্চয় ম্যাকগয়ার মিয়া অস্থির হয়ে উঠছে। দেরি পছন্দ করে না সে।'

কেবিনে এসে ঢুকলো ওরা। তীক্ষ্ণ নজর বোলালো ম্যাক, সামান্য বাঁকা হয়ে আছে সুজার টাইয়ের নট, সেটা সোজা করে দিলো। 'ও-কে, এবার হয়েছে। অভিজ্ঞতা নেই তোমাদের, তবে বুঝতে পারছি শিখিয়ে নিতে পারবো। কাজ খুব সহজ, বিশেষ করে এই যাত্রায়। একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার, থাকার কথা ছিলো অবশ্য তিনজন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে জানানো হয়েছে, অন্য দু'জন আসছে না।'

'ভুল করেছে,' সুজা বললো, 'ওই দু'জনের কথা বলছি। ইয়টের আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত হলো।'

'হয়তো পরের যাত্রায় আসবে,' বললো রেজা।

'সন্দেহ আছে,' মাথা দোলালো ম্যাক। 'হঠাৎ করে কাউকে প্যাসেঞ্জার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দেয়ার মানে এই নয় যে শুধু ওদের সাগরযাত্রা ক্যান্সেল, জীবনযাত্রা থেকেই ক্যান্সেল করে দেয়া হয় আসলে। আমার কথা বুঝতে পারছো?'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সুজা। 'তাহলে একজনেরই যত্ন নিতে হবে। নিশ্চয় ভি আই পি?'

'আমাদের সব প্যাসেঞ্জারই ভি আই পি,' হাসলো ম্যাক। 'অন্তত ওরা নিজেরা তা-ই মনে করে। পরে আর ওই ধারণা থাকে না।'

'সুতরাং বিশেষ যত্ন নিতে হবে তার,' রেজা বললো।

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো,' চওড়া হলো ম্যাকের হাসি। ড্রয়ার খুলে চিউইং গামের প্যাকেটের মতো একটা প্যাকেট বের করলো। রেজার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এটা দিয়ে কিভাবে কি করতে হয় জানো নিশ্চয়।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। 'খুদে ক্যামেরা, সম্ভবত বাজারের সব চেয়ে দামি মডেল। অনেক ব্যবহার করেছি।' কোথায় করেছে, সেকথা অবশ্যই জানালো না। এই জিনিসের ব্যবহার শিখেছে সে 'নেটওয়ার্ক'-এ, একটা অতি গোপনীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান ওটা।

'ক্যামেরা দিয়ে কি করবো?' জানতে চাইলো সে।

'আমাদের প্যাসেঞ্জার তার কেবিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করবে। তারপর ঢুকবে। ওর জিনিস আর কাগজপত্র ঘাঁটবে, ছবি-টবি আছে কিনা দেখবে, সন্দেহজনক সমস্ত কিছুর ছবি

তুলবে।'

'কি ধরনের জিনিস খুঁজবো আমরা?' সুজা জিজ্ঞেস করলো। 'মানে, কোন জিনিসটাকে সন্দেহ করবো?'

শ্রাগ করলো ম্যাক। 'জানি না। আমার ওপর আদেশ রয়েছে সন্দেহজনক সব কিছু, বিশেষ করে কাগজপত্র। আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। কেন যে কি করছি, জানি না। আদেশ আসছে, যন্ত্রের মতো পালন করছি, ব্যস।'

'আমি ওসব অতো জানতেও চাই না,' রেজা বললো। 'বেতনটা ঠিকমতো পেলেই খুশি।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো সুজা। 'বেশি জানলেই বরং অসুবিধে।'

'খুব ভালো কথা বলেছো,' ম্যাক বললো। 'এসো, প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। ওর নাম মার্ক। আসল নাম কি কে জানে। এটা বানানো। এখানে আসার আগে সবাই একটা করে বানিয়ে নেয়।'

পথ দেখিয়ে বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে ওদের-কে নিয়ে এলো ম্যাক। দরজায় টোকা দিলো।

'দাঁড়াও,' সাড়া এলো ভেতর থেকে। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। খুলে গেল পাল্লা।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটার গোলগাল মুখ, মাথা জুড়ে টাক, মাঝবয়েসী। পরনের শাদা ট্রপিক্যাল স্যুটটা দোমড়ানো। অতি সাধারণ চেহারা, শুধু নীল চোখ দুটো ছাড়া। রিমলেস চশমার

ওপাশে যেন সচল দুটো বরফের টুকরো। খুবই তীক্ষ্ণ। মুহূর্তের জন্যে একখানে স্থির থাকছে না। কড়া নজরে তাকালো তিনজনের দিকে।

'দরজায় তালা দেয়ার দরকার নেই, স্যার,' ম্যাক বললো বিনীত কণ্ঠে, 'বন্ধুদের মাঝেই রয়েছেন আপনি।'

'সেটা আমার ব্যাপার,' ধমকের সুরে বললো মার্ক। বরফ-শীতল কণ্ঠস্বর। শুধু আদেশ দিতেই অভ্যস্ত এই লোক, পালন করতে নয়। 'কি চাই?'

'এদেরকে নিয়ে এসেছি,' ম্যাক বললো, মুখে হাসি ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'রেজা আর সুজা। চব্বিশ ঘণ্টা আপনার ডিউটিতে থাকবে। খাবার আনা থেকে শুরু করে, কাপড় ধোয়া, ইস্তিরি করা, ঘর পরিষ্কার, সব করবে। যদি ক্যাপ্টেনের টেবিলে বসে একসঙ্গে খেতে চান, সেখানেও খাবার নিয়ে যাবে।'

'ক্যাপ্টেনের টেবিলে যাচ্ছি না আমি। এমনকি ডেকেও যাবো না। আমি এখানেই থাকবো, দরজায় তালা আটকে। তাতেও আমি পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করবো না। আমি শিওর, তোমাদের কাছে এই তালার আরও চাবি আছে।'

'নিশ্চয়ই না,' জোর দিয়ে বললো ম্যাক। 'সব চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে আপনাকে।'

'তাই নাকি?' ভোঁতা কণ্ঠে বললো মার্ক, বিশ্বাস করেনি। 'সে যাই হোক, ছেলেগুলো আমার খাবার দিয়ে যেতে পারে, অনুমতি দিলাম। বেশিদিন বোধহয় থাকতে হবে না এই নরকে, নাকি?'

এই প্রথম সূক্ষ্ম অনিশ্চয়তা ফুটলো তার কণ্ঠে।

'না, বেশি না। আজকের রাত, কালকের দিন, কালকের রাত, ব্যস। পরশু ভোরেই পৌঁছে যাবো।'

'জায়গাটা কোথায় নিশ্চয় বলা হবে না আমাকে?'

'না, এখন না। নিয়মের কথা তো জানাই আছে আপনার।'

'আছে। অনেক দেরিতে জেনেছি,' নিমের তেতো ঝরলো মার্কের কণ্ঠে. 'এতো দেরি যে আর পিছানোর উপায় ছিলো না।'

'আমি কথা দিতে পারি, এখানে আপনার সবই ভালো লাগবে। পছন্দ হবে।'

'সে তো বুঝতেই পারছি,' নাক কুঁচকালো মার্ক। 'যাও, এখন দূর হও। খিদে পেলে ডাকবো। দুটো চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর এক বোতল সোডা ওয়াটার, আর কিছু না। বুঝেছো?'

'বুঝেছি, স্যার,' জবাব দিলো রেজা।

'আর কিছু লাগবে?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'লাগবে, আমার প্রাইভেসি। যাও, ভাগো। না ডাকলে আর বিরক্ত করবে না।'

বারান্দা ধরে আবার ফিরতে ফিরতে বিড়বিড় করলো রেজা, 'গেল আমাদের জিনিসপত্র ঘাঁটা।'

'বোকা নাকি?' ম্যাক হাসলো। 'ও-ব্যাটা মনে করেছে খুব চালাক। এসো, আমার কেবিনে।'

কেবিনে ঢুকে, বাদামী একটা শিশি বের করলো ম্যাক, তাতে অনেকগুলো বড়ি। একটা বের করে রেজাকে দিয়ে, শিশিটা আবার

রেখে দিলো ডেস্কের ড্রয়ারে।

'খাবার দিতে যখন ডাকবে,' বললো সে, 'সোডা ওয়াটারে এটা মিশিয়ে দিও। বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে ঘুম আসতে। পাঁচ ঘণ্টা আর কানের কাছে বোমা মারলেও জাগবে না। ঘরে ঢুকে কাজ সেরে ফেলবে তখন।'

'ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা,' আঙুল মটকালো ম্যাক, 'ভুলেই গিয়েছিলাম।' আরেকটা ড্রয়ার খুললো সে। 'এই নাও কেবিনের চাবি।'

'ঠিকই বলেছে তাহলে সে, চাবি রেখে দিয়েছেন,' রেজা বললো।

'ধাড়ি বদমাশ। বুঝবে না মানে? শুধু জানে না, হেরে ভূত হয়ে আছে। সব কিছু এখন আমাদের কব্জায়, জীবন পর্যন্ত।'

'দুঃখ হচ্ছে বেচারার জন্যে।'

এক ঘণ্টা পর খাবারের জন্যে ঘণ্টা বাজালো মার্ক। সুজা নিয়ে গেল চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর ওষুধ মেশানো সোডা।

'উঁহু, পচা রুটি,' আঙুল দিয়ে ছুঁয়েই বলে উঠলো মার্ক। 'আর সোডাতেও ঝাঁঝ আছে বলে মনে হয় না, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ...এই ছেলে, জ্যাকেটের সব বোতাম লাগাও না কেন?'

'সরি, স্যার,' সুজা বললো।

'একটা কানাকড়ি টিপস দেবো না। যাও, ভাগো,' হাত নেড়ে যেন মাছি তাড়ালো মার্ক।

বারান্দায় বেরিয়েই মার্কের দরজায় তালা লাগানোর শব্দ শুনলো সুজা। ফিরে এলো তার কেবিনে।

'কি কাজ যে করতো লোকটা আল্লাহ্‌ই জানে,' বললো সে।

'আরিব্বাপরে বাপ, যা বদমেজাজী।' রেজা নিচের বাংকে শুয়ে বিশ্রাম করছে। সুজা উঠে গেল ওপরেরটায়। কাজ শুরু করতে দেরি আছে এখনও।

ঘড়ি দেখলো রেজা। 'এক ঘণ্টা দেরি করবো আমরা। ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে মার্ক। তারপর গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবো।'

'ভালোই হলো,' সুজা বললো। 'না বুঝে তদন্তের সুযোগ করে দিলো আমাদেরকে ম্যাক। কাজ সহজ করে দিলো।'

'তা করেছে। সুযোগ যা পাবো সবগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে। তুই যাওয়ার পর বসে থাকিনি, ওয়ার্ডরুমে গিয়েছিলাম। নাবিকদের কেউ কিছু জানে না, কিংবা জানলেও মুখ বন্ধ রেখেছে।'

'কিন্তু তাতে তথ্য জানা বন্ধ করতে পারবে না তোমার,' হেসে বললো সুজা।

এক মুহূর্ত ভাবলো রেজা। 'নাহ, আসলেই বোধহয় কিছু জানে না ওরা। নাটের গুরু যে-ই হোক, সাংঘাতিক চালাক। ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে দিয়েছে পুরো অপারেশনটাকে, যাতে পুরো চিত্র কেউ আঁচ করতে না পারে। ম্যাকের কথা থেকে যা বুঝলাম, ফ্লোরিডা আর এই জাহাজের মধ্যে কম্যুনিকেশন গ্যাপ রয়েছে, গ্যাপ রয়েছে এই জাহাজ আর গন্তব্যস্থলের সঙ্গে। ফ্লোরিডা থেকে কেউ অনুসরণ করতে চাইলে করতে পারবে না, কারণ যোগসূত্রই খুঁজে পাবে না একটার সঙ্গে আরেকটার।'

'দেখো, ওরকম করে বলো না। বড় হতাশ লাগে।'

হাসলো রেজা। 'আমরা একেবারে অন্ধকারে হাতড়ে মরছি না,

কি বলিস ? অন্তত একটা দরজা খুলতে পারবো। আলো ফুটতেও পারে ওটার ভেতরে,' বলে পকেটে চাপড় দিলো সে, যেখানে চাবিটা রেখেছে।

আরও আধ ঘণ্টা পর মার্কের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

'ওষুধ কাজ করলো কিনা দেখি আগে,' রেজা বললো। জোরে জোরে দরজায় থাবা দিলো সে।

জবাব নেই।

'নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে,' সুজা বললো।

'ঢোকা যায় বোধহয় এবার।' পকেট থেকে চাবি বের করে তালায় ঢোকালো রেজা। মোচড় দিয়ে তালা খুললো। তারপর আস্তে ঠেলা দিলো পাল্লায়।

আগে ঢুকলো সুজা।

'আলো জ্বাললেও আর অসুবিধে নেই,' বলতে বলতেই গিয়ে সুইচ টিপলো সে।

আলো জ্বলে উঠলো। শুয়ে আছে মার্ক, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে।

'মরে গেল নাকি,' হাসলো সুজা। 'নড়েও তো না।'

রেজা ঢুকলো। স্থির হয়ে গেল পা বাড়াতে গিয়েই।

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে একটা বাহু, ঝটকা দিয়ে পেছনে নিয়ে গেছে মাথা, গলার নিচটা ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। সেই অংশে চেপে বসলো ঠাণ্ডা, ধারালো

একটা জিনিস।

কানের কাছে হিসহিস করে উঠলো মার্কের কণ্ঠ, 'ছুরিটায় ক্ষুরের মতো ধার। একটু নড়লেই গলা দু'ফাঁক হয়ে যাবে।'

সাত

যেদিন ব্রাউন বেল্ট পেয়েছে রেজা, সেদিন তার ওস্তাদ একটা উপদেশ দিয়েছিলেন : যতো ক্ষমতাই তোমার থাক, তার সীমা আছে। কাজেই বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেলে সীমা ছাড়িও না। অপেক্ষা করবে। আঘাত করার সুযোগ অবশ্যই আসবে, তার আগে কিছুতেই আঘাত করতে যেও না।

গলায় ছুরির শীতল স্পর্শ সেই কথা মনে করিয়ে দিলো তাকে। যতো তাড়াতাড়িই সে করুক, যতো ক্ষিপ্রতাই দেখাক, কনুই চালাতে গিয়ে এখন ছুরির সঙ্গে পারবে না। তার আঘাত হয়তো প্রতিপক্ষের পেটে লাগবে, তবে গলাও ফাঁক হয়ে যাবে ততোক্ষণে।

'সুজা, কিছু করিস না,' সে বললো। 'তাহলে আমি মারা যাবো।'

ঘুরে দাঁড়িয়েছে সুজা। হাত তুলে দেখালো, যাতে মার্ক দেখতে পারে তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। 'আমি কিছু করবো না।'

'বোকা নও তোমরা,' মার্ক বললো। 'তবে চালাকও নও। কি করে ভাবলে তোমাদের ফাঁদে পা দিয়ে ওষুধ মেশানো সোডা খেয়ে ফেলবো আমি?'

'কি করে বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করলো রেজা। মার্ককে কথা বলাতে চায়। কথা বলায় ব্যস্ত থাকলে সতর্কতা নষ্ট হবে, মুক্তির সুযোগ করে নিতে পারবে সে। ছুরিটা গলার ধমনীতে চেপে বসেছে। চাপ আরেকটু বাড়লেই কেটে যাবে, রক্তের ফোয়ারা ছুটবে।

'কি করে ভাবতে পারলে,' মার্ক বললো, 'এতো সহজেই তোমাদেরকে বিশ্বাস করবো? এতো বোকা হলে দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারতাম না এতোদিন। সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করি আমি। তোমাদের দলের লোকেরা সার্চ করেছে আমাকে, অস্ত্র-টস্ত্র আছে কিনা দেখেছে, ছাতার ভেতরে ছুরিটা লুকিয়ে রেখেছিলাম তখন। এসব বেঈমানী আর ফাঁকিবাজির খেলায় বাঘা বাঘা ওস্তাদকে হারিয়ে দিয়ে এসেছি আমি, আর সেই তুলনায় তোমরা তো শিশু।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসলো মার্ক, কেঁপে উঠলো হাতের ছুরি।

'এই, আস্তে,' জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে রেজা, গলার রগ যদি ফুলে ওঠে?

'তারমানে মরতে চাও না?' আরও জোরে হেসে উঠলো মার্ক। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো রেজা। সুজা তাকিয়ে রয়েছে আতঙ্কিত অসহায় দৃষ্টিতে। 'আমি জানি, তোমরা আমার প্রত্যেকটা

পাই পয়সা চিপে বের করে নেয়ার আগে থামবে না। সঙ্গে যা আছে সেগুলো তো নেবেই, যা লুকিয়ে রেখে এসেছি ওগুলোও ছাড়তে চাইবে না।'

'দেখুন, মিস্টার,' মরিয়া হয়ে বললো রেজা, 'আমরা স্রেফ ভাড়াটে লোক। আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়, সেই মতো কাজ করি।'

'জানি,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো মার্ক। 'আর সেজন্যেই তোমাদেরকে মারবো না আমি। বরং ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে একটা অফার দেবো। বিশ হাজার ডলারের কথা শুনতে কেমন লাগে? প্রত্যেকে বিশ হাজার করে?'

'কিসের বিনিময়ে?' জানতে চাইলো সুজা।

তাড়াতাড়ি বললো রেজা, 'যার বিনিময়েই হোক, তাতে কি আসে যায়? বিশ হাজারের জন্যে সব করতে রাজি আছি আমি।'

'জানতাম একথাই বলবে,' সন্তুষ্ট হলো মার্ক। 'ভাড়াটে লোক হলে এই এক সুবিধে। যেখানে টাকা বেশি পায় সেখানেই চলে যায়।'

রেজাকে ছেড়ে দিলো সে।

লম্বা দম নিলো রেজা। যেখানে ছুরি চেপে ধরা হয়েছিলো সেখানটা ছুঁয়ে আঙুল নিয়ে এলো চোখের সামনে। না, রক্ত নেই, কাটেনি।

'দেখাচ্ছি, দাঁড়াও,' মার্ক বললো। 'তাহলে তোমরাও আমার কথা বিশ্বাস করবে, আমিও তোমাদের বিশ্বাস করতে পারবো।'

বিছানার কাছে গিয়ে টান দিয়ে চাদর সরালো। নিচে একগাদা কাপড় এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ওপরে চাদর ঢাকা দিলে মনে হয় চাদরমুড়ি দিয়ে কেউ ঘুমিয়ে আছে। কাপড়ের নিচ থেকে টেনে বের করলো একটা অ্যাটাচি কেস।

কেসটা পরিচিত লাগলো দুই ভাইয়ের কাছে।

এবং ভেতরের জিনিসগুলোও।

একশো ডলার নোটের বাণ্ডিল।

ওরা যেটা ফেলে এসেছে ফ্লোরিডায়, ওটার সঙ্গে এটার অমিল শুধু একটা ব্যাপারে, ওটা কিছু খালি হয়েছিলো; এটা একেবারে ভরা।

'পুরোটা ছিনিয়ে নেয়ার কথা মনেও এনো না,' হুঁশিয়ার করলো মার্ক। 'লাভ হবে না। সেই চেষ্টা যদি করো, তোমার ওপরওয়ালার কাছে নালিশ করবো আমি। আর আমার মুখ বন্ধ করার কথাও ভুলে যাও। কারণ, সোনার ডিমপাড়া হাঁসকে কেউ খুন করুক, এটা কিছুতেই চাইবে না তোমার বস্।'

'দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করেন না আপনি, তাই না?' সুজা বললো।

'করা কি উচিত?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মার্ক। জবাবের অপেক্ষা না করে বললো, 'আমি শুধু বিশ্বাস করি টাকার ক্ষমতায়। এই টাকা আমাকে এতোদূর পার করে এনেছে, বাকিটাও করবে, মুক্ত করবে।'

'আপনার ভাবনা হয় না?' রেজা বললো। 'ওরা সব কেড়ে

নিতে পারে আপনার কাছ থেকে। মেরে ফেললে কে দেখতে আসছে ?'

দেঁতো হাসি হাসলো মার্ক। 'একে কি টাকা মনে করো নাকি ? তা তোমরা অবশ্য করবে। আমার কাছে এ-কিছুই না। কয়েকটা ভাঙতি পয়সা মাত্র।'

'ভাঙতিটা খুব বড়,' মন্তব্য করলো সুজা।

'আমি মানুষটাও বড়,' গর্বের সুরে বললো মার্ক। 'এতোক্ষণে নিশ্চয় সেটা বুঝে গেছ।'

'তা বুঝেছি।'

'যে টাকা অফার করেছেন, আমরা রাজি,' রেজা বললো। 'কি করতে হবে ?'

'তোমার বসেরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, বলো। ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চায় ?' মার্কের গলায় অনিশ্চয়তার সুর, যদিও মুখে সাহসের বড় বড় বুলি আউড়েছে।

'বলতে পারলে খুশিই হতাম,' রেজা বললো।

'ভাড়াটে লোককে বিশ্বাস করে না ওরা,' বললো সুজা।

অবাক হলো না মার্ক। মাথা ঝাঁকালো। 'বুঝতে পারছি। এই প্রতিষ্ঠান যে চালাচ্ছে, সে খুব চালাক লোক। এ-ব্যাপারে ওর প্রশংসা না করে পারছি না। কাউকে বিশ্বাস করে না, আমারই মতো। যা বলি, শোনো। আমি যা জানতে চাই সেটা জানার চেষ্টা করবে। আমাকে নিয়ে আবার নতুন কোনো শয়তানী তোমার বসেরা করার প্ল্যান করলে সাথে সাথে এসে সেটা জানাবে। পেয়ে যাবে তোমা-

দের বিশ হাজার, সেই সাথে একটা বাড়তি বোনাস।' একটা বাণ্ডিল থেকে কয়েকটা নোট বের করলো মার্ক। 'এই যে, এক হাজার করে আছে। আগাম দিলাম। রেখে দাও, এবং কাজ শুরু করো।'

'করবো,' টাকাটা পকেটে ভরে রাখলো সুজা।

'এখন থেকেই খোঁজখবর শুরু করবো আমরা,' রেজা বললো। 'কিছু জানতে পারলেই চলে আসবো আপনার কাছে।'

'ও-কে। যাও এখন,' হাত নেড়ে আবার মাছি তাড়ালো মার্ক। 'ওরা তো জিজ্ঞেস করবে কি কি পেয়েছো এখানে। শুধু স্যুট-কেসটার কথা জানাবে ওদের। ওতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে ওরা।'

মার্ককে খুশি করার জন্যে বললো রেজা, 'সবকিছু আগাম ভেবে রাখেন আপনি।'

'সে-জন্যেই সব কিছু পেয়েছি।' একটা সোনার লাইটার বের করে সিগার ধরালো মার্ক।

বেরিয়ে এলো রেজা সুজা।

বারান্দায় এসে ভাইয়ের দিকে ঘুরলো রেজা। 'মনেই হয় না জাহাজে রয়েছি। মনে হচ্ছে অকূল সাগরে ভাসছি আমি, চারপাশে কিলবিল করছে অসংখ্য হাঙর।'

'এবং সব কটা মানুষখেকো,' বললো সুজা।

'চল, ম্যাককে গিয়ে মার্কের টোপ গেলাই। খুশি হবে।'

গল্প বিশ্বাস করলো ম্যাক, খুশিও হলো। বললো, 'আমাদের কাজ আমরা করেছি। আর কিছু বলতে পারবে না। কেবিনে যদি কিছু না থাকে আমরা কি করবো?'

'প্যাসেঞ্জারের খোঁজখবর নিয়ে কি করবে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো

রেজা।

'জানি না। জাহাজের মালের সঙ্গে ওকেও নামিয়ে নিয়ে যাবে। আর ওর দেখা পাবো না। এটুকুই জানি।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'

রেজার চোখের দিকে তাকালো ম্যাক। 'বলেছিই তো, আমাদের কাজ মাল আর প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে আসা। এরপর কি হয় না হয়, কিছুই জানি না, বলা হয় না আমাদেরকে।' তীক্ষ্ণ হলো দৃষ্টি। 'এই, এতো প্রশ্ন করছো কেন? খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে?'

তাড়াতাড়ি কথা কাটালো সুজা, 'ও সব সময়ই এরকম, বেশি আগ্রহ। কতো বলি, এই স্বভাবের কারণে ভীষণ বিপদে পড়বে একদিন। শোনে না।...তো, এখন আর কি করবো? কাজ আছে, নাকি ছুটি?'

'গ্যালিতে গিয়ে বসে থাকো। পালা করে ডিউটি দেবে। সব সময় যাতে একজনকে পাওয়া যায়। অন্যজন কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকো, কিংবা রিক্রিয়েশন রুমে গিয়ে তাস খেল, যা খুশি করতে পারো। তবে সব জায়গায় যাওয়ার অধিকার নেই তোমাদের। কড়া নিয়ম এখানে, মেনে চলতেই হবে। না মেনে চললে শুধু যে চাকরি যাবে তাই না, আরও কিছু হবে। বুঝতে পেরেছো আমার কথা?'

'বুঝেছি,' রেজা বললো।

'না, নিয়ম ভাঙবো না আমরা,' সুজা বললো।

'আমি এখন ঘুমাবো,' হাই তুললো ম্যাক। 'জরুরী কিছু না হলে আমাকে ডাকবে না। ঘুমানোর সময় খুব কম। আর চব্বিশ

ঘণ্টা পরেই নোঙর ফেলবে জাহাজ। তারপর অনেক কাজ।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হলো রেজা। 'আরি, বুঝতেই পারিনি এখন দিন। সব কিছু এমন ঢাকাঢুকা, রাতদিনের তফাৎই বোঝা যায় না।'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই,' ম্যাক তার বাংকে শুয়ে পড়লো। 'আমাদেরকে অন্ধকারে রাখতেই পছন্দ করে বসেরা।'

রেজা সুজা দরজার কাছে পৌঁছেও সারতে পারলো না, নাক ডাকানো আরম্ভ হয়ে গেল ম্যাকের। আস্তে দরজা বন্ধ করে দিলো রেজা। বললো, 'আমি গ্যালিতে যাই। দেখি গিয়ে বাবুর্চি ব্যাটা কিছু জানে কিনা। আশা যদিও তেমন নেই।'

'আমিও গিয়ে খোঁজাখুঁজি করি।'

'খুব সাবধানে করবি।'

'সেকথা আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমাকে তুমি চেনো।'

'ভয়তো সেজন্যেই।'

আস্তে ভাইয়ের কাঁধে চাপড় দিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলো সুজা। গ্যালির দিকে রওনা হয়ে গেল রেজা। সুজা রওনা হলো সেদিকে, যেদিকে তাদের যাওয়া বারণ।

কোনোদিকে যাওয়া চলবে না ; মানা করে দিয়েছে ম্যাক। মানা না করলেও নিষিদ্ধ এলাকা কোনটা বুঝতে অসুবিধে হতো না সুজার। একটা সিঁড়ির পাশে লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে : সাবধান! নিষিদ্ধ এলাকা! ছাড়পত্র ছাড়া কর্মচারীদের এর ওপাশে

যাওয়া বেআইনী। আদেশ অমান্যকারীর কঠিন শাস্তি হবে! কঠিন শব্দটার তলায় কালো দাগ টানা, বিশেষত্ব বোঝানোর জন্যে।

চট করে একবার বারান্দার এমাথা ওমাথা দেখে নিলো সুজা, কেউ আছে কিনা কিংবা আসছে কিনা। তারপর নেমে পড়লো সিঁড়িতে।

ম্লান আলোকিত মাল রাখার জায়গায় নেমে এলো সে। কয়েক ডজন কাঠের বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কোনোটাতে কিছু লেখা নেই। কয়েকটার ওপর পেনলাইটের আলো ফেলে ভালো করে দেখলো। ওগুলোর মাঝের সঙ্কীর্ণ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কস-মোলিনের মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো তার। ওটা একধরনের গ্রীজ, আগ্নেয়াস্ত্র বাক্সবন্দী করার আগে মাখিয়ে দেয় প্রস্তুতকারীরা, যাতে মরচে পড়ে নষ্ট না হতে পারে। গন্ধটা বেপোর্টের ন্যাশনাল গার্ড আরমারির কথা মনে পড়িয়ে দিলো তাকে।

ভেতরে কি আছে আন্দাজ করে ফেললো সে। পকেট থেকে বের করলো সুইস আরমি নাইফ, স্টুয়ার্ডের ইউনিফর্মের সঙ্গে এটাও সরবরাহ করা হয়েছে ইয়টে। ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় মেরে ফাঁক করলো বাক্সের ডালা। হাত ঢোকালো ভেতরে।

চটচটে আঠালো জিনিস লাগলো হাতে। বের করে এনে দেখলো আঙুলে গ্রীজ লেগে গেছে।

লেগেই যখন গেছে, এর বেশি আর ময়লা হবে না, ভাবতে ভাবতে টান দিয়ে ডালাটা আরও ফাঁক করলো। দু'হাত ঢোকালো এবার। গ্রীজ মাখা ধাতব জিনিসটা হাতে লাগতে শক্ত করে ধরে

টান দিলো। পিছলে যেতে চায়, কিন্তু ছাড়লো না। বের করে আনলো। একটা সাবমেশিনগান। এক নজর দেখেই তাড়াতাড়ি আবার ওটা জায়গামতো রেখে দিয়ে চেপে নামিয়ে দিলো ডালা। নিচে বিছিয়ে রাখা চটে হাত মুছলো। তাকালো অন্য বাক্সগুলোর দিকে।

'আস্ত এক অস্ত্রের গুদাম,' বিড়বিড় করলো সে। এক কোণে অন্য ধরনের বাক্স চোখে পড়লো। ফাইবার গ্লাস আর ইস্পাতের তৈরি।

ওগুলোতে কি আছে? ভাবতে ভাবতে এসে দাঁড়ালো বাক্স-গুলোর কাছে। খুলে দেখলো একটা খাঁজকাটা ফোমের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র। চিনতে সময় লাগলো না। লাই ডিটেক্টর।

'মেশিনগান! লাই ডিটেক্টর!' ফিসফিস করে নিজের সঙ্গেই কথা বললো সে। 'দাদাকে জানানো দরকার··'

এই সময় শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি কয়েকটা বাক্সের মাঝের ফাঁকে লুকিয়ে বসে পড়লো সে।

কথা বলছে দু'জন লোক। তর্ক করছে বোধহয় কোনো ব্যাপারে, এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায় না।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো সুজা। পা টিপে টিপে এগোলো শব্দ লক্ষ্য করে। শেষ সারি বাক্সের পাশ ঘুরে আসতেই চোখে পড়লো একটা ইস্পাতের দরজা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, ভেতরে শোনা যাচ্ছে কথা।

'খিদেয় মরে গেলাম,' বললো একটা কণ্ঠ। 'ওপরে যাই, দেখি কিছু মেলে কিনা।'

'বসের অর্ডার জানা আছে তোমার,' বললো দ্বিতীয় কণ্ঠ। 'ক্রুদের সঙ্গে মিশতে মানা করে দেয়া হয়েছে। কাল মাল নামানোর আগ পর্যন্ত ওদের চোখে পড়া চলবে না আমাদের।'

'আমার কপালই মন্দ,' বললো প্রথমজন, 'তোমার মতো একজন অক্ষরে-অক্ষরে-আদেশ-মেনে-চলা সঙ্গী জুটেছে।'

'টাকা তুমিও আমার সমানই পাবে,' বললো দ্বিতীয় লোকটা। 'আমি কষ্ট করতে পারলে তুমি পারবে না কেন? লোভনীয় চাকরি, তোমার বোকামির জন্যে সেটা হারাতে রাজি নই।'

'যা-ই বলো, আমি আর থাকতে পারছি না। নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে গেছে আমার। কিছু না খেয়ে আর থাকতে পারবো না।'

এতো আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা, লুকানোর সময়ই পেলো না সুজা। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। চোখাচোখি হয়ে গেল দু'জনের।

কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলো সুজা। কিন্তু কৈফিয়ৎ শোনার অপেক্ষা করলো না লোকটা। সুজা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত চালালো সে।

লোকটার ঘুসি চোয়ালে লাগার আগে একটা কথাই শুধু খেলে গেল সুজার মনে: ধরা পড়ছি আমি, ধরা! তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে কালো রাত্রি নামলো তার চোখে।

আট

পড়ে গেলেও পুরোপুরি অচেতন হয়নি সুজা। অচেতনতার পর্যায়ে চলে গেছে মন, শরীর সক্রিয়ই রয়েছে। তাই মেঝেতে পড়েই গড়াতে শুরু করলো সে, যাতে আর কোনো আঘাত না লাগতে পারে শরীরে। ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলো মাথার ভেতরের মাকড়সার জাল।

পরের দুটো সেকেণ্ড দু'ঘণ্টার মতো মনে হলো। গড়ানো থামিয়ে টান টান করলো পা, জোর করে চোখ মেললো, যদিও খুলতে ইচ্ছে করলো না।

ঘোলাটে দৃষ্টিতে দেখলো, এগিয়ে আসছে লোকটা। দেখছে, কিন্তু কিছু করার সাধ্য নেই। লোকটার বুট এগিয়ে আসছে তার চোয়াল লক্ষ্য করে, অথচ বাধা দেয়ার ক্ষমতা নেই তার।

তবে চোয়ালে লাথিটা লাগাতে পারলো না লোকটা।

এতো জোরে শব্দ হলো, সুজার মনে হলো তার মাথার ভেতর

ঘণ্টা পেটালো কেউ। ঝনঝন শব্দ হলো, কতগুলো বাসন-পিরিচ পড়লো যেন।

কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে উঠে বসলো সুজা। ঘোলা হয়ে রয়েছে এখনও মাথার ভেতরটা। দেখলো, ইস্পাতের ভারি ট্রে-টা তুলে আবার লোকটার মাথায় বসিয়ে দিচ্ছে রেজা। তারপর ঘুরলো দ্বিতীয় লোকটার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। আওয়াজ শুনে ছুটে আসছে সে।

ট্রে-এর এক পাশ দিয়ে লোকটার পেটে বাড়ি মারলো রেজা, দা দিয়ে কোপানোর মতো করে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল লোকটা। দড়াম করে তার চোয়ালে বাড়ি মারলো আবার রেজা। ঝাঁকুনি দিয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল লোকটার মাথা। টলে উঠলো। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো, একটা মুহূর্ত সেঁটে রইলো যেন দেয়ালের সঙ্গে, তারপর খসে পড়লো।

দুটো লোককেই পরীক্ষা করলো রেজা। দু'জনেই বেহুঁশ। এগিয়ে এলো রেজার কাছে। 'ঠিক আছিস?' ভাইকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো সে।

চোয়ালে হাত বোলালো সুজা। 'নাহ্, ভাঙেনি, বেঁচে গেছি। মনে হয়েছিলো মুগুরের বাড়ি মেরেছে।··· চোয়ালে ওর লাথিটা লাগলে গেছিলাম।··· তা একেবারে সময়মতো কি করে এসে হাজির হলে?'

'তোর কপাল ভালো আরকি,' রেজা বললো। 'গ্যালিতে বসে আছি। বাবুর্চি এসে বললো ম্যাককে ডেকে দিতে। এই লোক-

গুলোকেই বোধহয় খাবার দিয়ে যাওয়ার কথা ম্যাকের। আর কারও আসার অনুমতি নেই এদিকে। বাবুর্চিকে বোঝালাম, মাত্র শুয়েছে ম্যাক, এখন ডাকলে খুব রেগে যাবে। বাবুর্চি বুঝলো। আমি খাবার নিয়ে আসার প্রস্তাব দিলাম, কি ভেবে রাজি হয়ে গেল সে। তবে বার বার হুঁশিয়ার করে দিলো, মুখ বন্ধ রাখতে। খাবার দিয়েই যেন চলে যাই, লোকগুলোর সঙ্গে কথা না বলি। নতুন তথ্য জানা যাবে ভেবে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম। কল্পনাই করিনি তুই এই বিপদে পড়বি।'

'ঝুঁকি না নিলে পুরস্কার মেলে না,' দুর্বল কণ্ঠে বললো সুজা। 'ঝুঁকিটা নেয়াতেই জানতে পেরেছি বন্দুকের বাক্সে বোঝাই হয়ে আছে জায়গাটা, আর কিছু অদ্ভুত যন্ত্র। মেশিনগান দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম অস্ত্র চোরাচালানির পাল্লায় পড়েছি। তারপরই দেখলাম লাই ডিটেক্টর। আমার বিশ্বাস, আরও কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে কোণের ওই বাক্সগুলোয়। এখন আর অস্ত্র চোরাচালানি বলতে পারছি না, যন্ত্রগুলো গুলিয়ে দিয়েছে সব।'

'আমিও পারছি না। একের পর এক কেবল প্রশ্নই বের করছি, জবাব আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ওদের কথা থেকে একটা কথা বুঝেছি আমি,' সুজা বললো। 'এসবের যে হোতা, তার ওখানে কাজ নিয়েছে লোকগুলো। ওদের কথা থেকে বোঝা গেল মালের সঙ্গে ওদেরকেও নামিয়ে দেয়া হবে।'

'তাই নাকি,' নতুন আগ্রহ নিয়ে অচেতন লোকগুলোর দিকে তাকালো রেজা। 'আয়, বেঁধে ফেলি। তারপর জেনে নেবো ওরা

কি কি জানে।'

দড়ি খুঁজে পাওয়া গেল। বাঁধতে বাঁধতে একটা মতলব এলো রেজার মাথায়। বললো, 'তথ্য জানার চেষ্টা করে লাভ হবে না। বেশি কিছু জানে না ওরাও, বাজি রেখে বলতে পারি। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে বলাই হবে না ওদেরকে ওদের কি কাজ।'

'ঠিক,' সুজা বললো। 'কোথায় কি হচ্ছে সেটা জানতে হলে আমাদেরকেই গিয়ে সেটা জানতে হবে।'

'ওদের জায়গায় আমরা হলে পারতাম,' বলে লোকগুলোর দিকে তাকালো রেজা।

নীরবে সুজাও তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। জিজ্ঞেস করলো, 'আমিও ওই কথাই ভাবছি।'

'পাগলামি হয়ে যাবে না সেটা?'

'ওই যে বললাম, ঝুঁকি না নিলে পুরস্কার মিলবে না। আকারে উচ্চতায় এরা কিন্তু আমাদের সমান।'

'আর চুলের রঙও প্রায় এক,' রেজা বললো। 'জাহাজের যারা যারা দেখেছে আমাদেরকে, তাদেরকে ফাঁকি দিতে পারলেই এই দু'জনের জায়গায় নিজেদের চালিয়ে দিতে পারবো।'

'জানতাম, এরকমই একটা কিছু করবে তুমি,' হাসতে হাসতে বললো সুজা।

কি ভাবছে সেটা ভাইকে জানালো রেজা, 'ওদের পলিসিতে দুর্বলতা আছে। কর্মচারীদের অন্ধকারে রেখে বস্‌টা হয়তো ভাবছে খুব চালাকি করছি, আসলে ভুল করছে সে। কেউ কাউকে চিনতে

পারছে না। আমরাও এক জায়গা থেকে পালিয়ে আরেক জায়গায় সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছি, একদলের সঙ্গে আরেক দলের যোগাযোগ থাকছে না বলেই। আশা করি এবারেও ধরা পড়বো না, এদের জায়গায়,' দু'জনকে দেখালো সে, 'নিজেদের চালিয়ে দিয়ে।'

'ঠিকই বলেছো।'

'তবে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক হবে না। বলা যায় না, এই ফাঁকি কতদুর পর্যন্ত চালাতে পারবো। এমন কারও সামনে পড়ে যেতে পারি যে সহজেই ধরে ফেলবে আমাদের এই ফাঁকিবাজি। কারও সাহায্য পাবো না। সাংঘাতিক বিপদে পড়বো তখন।'

'তাহলে পালানোর পথ আগেই তৈরি করে রেখে তারপর এগোবো।'

'সহজ হবে না সেটা। ভেবে দেখবো কি করা যায়। আপাতত মার্ককে গিয়ে জানাতে হবে।'

'কেন? ওকে বিশ্বাস করো নাকি?'

'না। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চাই, জাহাজ থেকে নামতে দেখলে আমাদেরকে যেন না ধরিয়ে দেয়। মালের বাক্স আর আমাদের সঙ্গে তাকেও একই জায়গায় খালাস করা হবে।'

টেনে লোক দু'জনকে সেই ঘরটায় নিয়ে গেল ওরা, যেখান থেকে ওরা বেরিয়েছে। আরেকবার দেখলো, বাঁধন ঠিক আছে কিনা। তারপর মুখে কাপড় গুঁজে দিলো। ওদের পোশাক আপাতত পরার দরকার নেই, জাহাজ তীরের কাছাকাছি হলে এসে পরে নিতে পারবে।

মার্কের কেবিনে এলো ওরা।

দেখে খুশি হলো মার্ক।

'কি জানলে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সরি,' সুজা বললো, 'কেউ কিছু জানে না।'

'আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার,' রাগ করে বললো মার্ক। 'তোমাদের দুই গাধাকে টাকা দিয়েই ভুল করেছি। এখন আমার টাকা ফেরত চাই।'

'যদি না দিই? কি করতে পারবেন? কেড়ে নেবেন নাকি?'

'দরকারই নেই। আমি শুধু নালিশ করবো, জাহাজে আমার কেবিন থেকে দু'হাজার ডলার চুরি হয়েছে। তোমার বসেরাই টাকাটা আদায় করে দেবে।'

'দারুণ লোক আপনি,' মার্কের নাকের সামনে মুঠো নাচালো সুজা। সবটাই তার অভিনয়। এরকম ব্যবহারই করে তার বয়েসী চোর-ছ্যাঁচোড়েরা। 'ইচ্ছে করছে...'

তাড়াতাড়ি বাধা দিলো রেজা, 'থাম, সুজা। ইচ্ছেটা আপাতত মনেই থাকুক। মার্কের কাছে দু'হাজারের অনেক বেশি আছে, আয় করে নিতে পারি আমরা।'

টেকো লোকটার দিকে ফিরে মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'আমার দোস্তের কথায় কিছু মনে করবেন না। বেশি কিছু জানতে পারিনি আমরা ঠিক, তবে আপনার পয়সা উসুল করার মতো তথ্য জানাতে পারবো। আসলে, বিশ হাজারের বেশিই হবে তার দাম।'

'দু'হাজার যে দিয়েছি সেটাই আয় করতে পারোনি এখনও,'

ধমক দিয়ে বললো মার্ক, 'চল্লিশ হাজারের আশা কর কি করে ?'

'হঠাৎ দুটো লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেছে, হওয়ার কথা ছিলো না,' রেজা বললো। 'নতুন লোক। আপনাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওরাও সেখানেই যাচ্ছে। এক হাজার করে দিয়ে দিতে পারি ওদেরকে, যে টাকাটা আমাদের দিয়েছেন, তাতে জায়গা বদল করতে রাজি হবে ওরা। ওদের বদলে আমরা যাবো। তাতে করে আমরা আপনার ওপর নজর রাখতে পারবো, দরকার পড়লে সাহায্যও করতে পারবো।'

'তবে,' কর্কশ কণ্ঠে বললো সুজা, 'যে টাকা দিতে চাইছেন, তাতে হবে না। অনেক বেশি দিতে হবে। কারণ অনেক বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা। ডাবল করে দিতে হবে।'

'একেবারে গলাকাটা ডাকাত,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো মার্ক।

'রাজি হওয়া না হওয়া আপনার ইচ্ছে,' রেজা বললো। 'নাহলে আপনার টাকা আমরা ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

ওদের মুখের দিকে তাকালো মার্ক। দু'জনেই গম্ভীর হয়ে আছে, শীতল চাহনি। শ্রাগ করলো সে। 'বেশ, দেবো। দুর্ব্যবহার করেছি, কিছু মনে করো না। সারা জীবনের স্বভাব, বদলাতে পারি না।' আন্তরিক হাসি উপহার দিলো সে।

নিজের মায়ের সঙ্গেও বেঈমানী করতে পারবে এই লোক, বুঝে ফেললো রেজা। একে আর সাপকে বিশ্বাস করা একই কথা। বললো, 'না না, মনে করার কি আছে। এরকম না করলে কি আর টাকা কামাতে পারতেন।'

'পেমেন্ট ঠিকমতো না পেলে অবশ্যই মনে করবো,' শাসিয়ে বললো সুজা, 'কথাটা মনে রাখবেন।'

মার্কের কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে রেজা বললো, 'ভালোই অভিনয় করেছি, কি বলিস। ওকে বিশ্বাস করানো গেছে টাকার জন্যে সব করতে পারি আমরা। গ্যালিতে যাচ্ছি। দেরি দেখলে আবার খোঁজা শুরু করতে পারে। খুঁজতে গিয়ে লোক দুটোকে দেখে ফেললে সর্বনাশ হবে।'

'হ্যাঁ,' সুজা বললো। 'আমি যাই। খানিকটা ঘুমিয়ে নিই। তোমার ঘুম পেলে এসে জাগিয়ে দিও আমাকে।'

গ্যালির দিকে চলে গেল রেজা। সুজা এলো কেবিনে।

বাংকটা দেখার আগে বুঝতেই পারেনি কতোটা ক্লান্ত হয়েছে। কাপড় খোলারও ইচ্ছে হলো না, শুধু জ্যাকেট আর জুতো খুলেই শুয়ে পড়লো বিছানায়। বালিশে মাথা ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

গভীর ঘুম। এতোই গভীর, স্বপ্নের মধ্যেও বুঝতে পারলো যে স্বপ্ন দেখছে। যেন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছে তার নিজের কাণ্ডকারখানা, তবে কোনো কিছুই ছুঁতে পারছে না তাকে, আহত করতে পারছে না।

নোভাকে দেখলো, সেই লিমোসিনের শোফার, তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে শাসাচ্ছে : জলদি দৌড়াও। জলদি। বুলেটের চেয়ে জোরে।

দৌড়াতে শুরু করলো সুজা। হোঁচট খেয়ে পড়লো বালিতে।

উঠতে আর পারলো না। ডুবে যাচ্ছে, আরও নিচে, আরও···

অবশেষে গর্তের তলায় এসে ঠেকলো। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলো আকাশ, আলো। হঠাৎ আলো ঢেকে দিলো একটা মুখ, লেমিল।

দাঁত বের করে হাসছে লেমিল। বিজেতার হাসি। 'যাক, শেষ-তক আমাকে আর কষ্ট করে তোমাকে চোরাবালিতে ফেলতে হলো না, তুমি নিজে নিজেই পড়লে। নিজের কবর নিজেই খুঁড়লে।'

লাথি মেরে মেরে গর্তে বালি ফেলতে আরম্ভ করলো লেমিল। ভরে ফেলতে লাগলো। মরিয়া হয়ে চেঁচাতে শুরু করলো সুজা, 'দাদাআ! দাদাআ! বাঁচাও আমাকে! বাঁচাও।'

মিলিয়ে গেল লেমিলের মুখ। সেই জায়গায় দেখা দিলো রেজা।

'দাদা,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুজা, 'জানতাম তুমি আসবে।' ভয় পেয়ে গেল আবার, যখন দেখলো রেজার মুখে হাসি নেই। গম্ভীর হয়ে আছে।

হঠাৎ টের পেলো তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে রেজা; তার ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

বিছানায় উঠে বসলো সুজা। মাতালের মতো তাকালো রেজার কাঁধের ওপর দিয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক, হাতে উদ্যত পিস্তল। ভয়ানক রেগে আছে।

সুজা বুঝলো, এটা স্বপ্ন নয়।

দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর বাস্তব।

নয়

'ওঠো !' কড়া গলায় আদেশ দিলো ম্যাক। 'উঠে দাঁড়াও !'

স্বপ্ন না বাস্তব এ-ব্যাপারে সন্দেহ যা-ও বা ছিলো সুজার, দূর হয়ে গেল। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ভাইয়ের পাশে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে হাত তুললো দু'জনেই।

'কি হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'গ্যালিতে ছিলাম, আধ ঘণ্টা আগে আমাকে ডেকে কফি আনতে বললো ম্যাক। নিয়ে যেই কেবিনে ঢুকলাম, আমার নাকের কাছে পিস্তল ধরে বললো তোর কাছে নিয়ে আসতে। আর কিছু করার ছিলো না আমার।'

'আর কিছু করারও নেই,' ম্যাক বললো। 'সুযোগ পাবে না। সাহস আছে বলতে হবে তোমাদের, আমাকে পর্যন্ত বলদ বানিয়ে ছেড়েছো।'

'কি করে জানলেন ?' জিজ্ঞেস করলো সুজা।

'তোমার কি মনে হয় ?' জবাবের অপেক্ষা না করে বললো ম্যাক, 'ঘুম থেকে জাগতেই মনে পড়লো মালখানায় বসে আছে দু'জন লোক। তাদেরকে খাবার দিয়ে আসার কথা আমার। গ্যালিতে গিয়ে দেখলাম রেজা নেই। বাবুর্চি জানালো কোথায় গেছে। তাকে বকা দিয়ে তাড়াতাড়ি গেলাম মালখানায়, রেজার মুখ বন্ধ করার জন্যে। যাতে মালখানায় যা দেখেছে সেকথা কাউকে কিছু বলতে না পারে। আন্দাজই করতে পারছো ওখানে গিয়ে কি দেখেছি।'

'পারছি,' দমে গেছে সুজা।

'এখন তোমাদের কি হবে তা-ও নিশ্চয় জানতে চাও ?'

'সত্যি বলতে কি, চাই না।' দ্রুত ভাবনা চলেছে মাথায়, এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে।

রেজাও তাই করছে। বললো, 'আগেই জানি আমি, এক সময় না একসময় আমাদের সৌভাগ্য ফুরোবেই। তবে নিশ্চয় স্বীকার করবেন, অনেক এগিয়েছি আমরা।'

'আরও এগোবে,' ম্যাক বললো। 'একেবারে সাগরের তলায় গিয়ে তারপর থামবে।'

'কি করতে হবে আমাদের ? নিজে নিজে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে ?'

'না, সেটা অনেকেই দেখে ফেলবে। এই ঘর থেকে তোমাদের জ্যান্ত বেরোতে দেয়া হবে না। গুলি করে মারবো প্রথমে। তারপর বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবো। মাছ ছাড়া আর কেউ তোমাদের সাক্ষাৎ পাবে না।'

'তাহলে আর দেরি করে কি লাভ? কাজ শেষ করে ফেলুন। আপনার ঘুম নষ্ট হচ্ছে।'

'থাক, ফেরার পথে ভালোমতো ঘুমিয়ে নিলেই চলবে। এখন ঘুমোতে পারলে ভালো হতো, পারছি না যখন কি আর করা···,' বড় করে হাই তুললো সে। 'আরে, এতো ঘুম আসছে কেন। ঘুমালাম তো···নাহ্, ওই ঘুমে কিছুই হয়নি, আরও অনেক বেশি···,' আবার হাই তুললো সে। 'আশ্চর্য। এরকম লাগছে কেন?' ঝাড়া দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলো।

'দাঁড়াতে না পারলে বসুন,' রেজা বললো। 'আপনাকে সত্যি খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না,' বাংকে বসে পড়লো ম্যাক। 'তবে তোমাদেরকে···,' হাই তুললো। '···তোমাদেরকে ছাড়ছি না···,' আর কিছু বলতে পারলো না সে। মুদে এলো চোখ। হাত থেকে খসে পড়লো পিস্তল।

'হাউফ্' করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো রেজা। 'ভয়ই পাচ্ছিলাম কাজ হবে কিনা ভেবে।'

'কাজ?' জানতে চাইলো সুজা। 'কিসের কাজ? কি হয়েছে?'

'গ্যালিতে যাওয়ার আগে মনে হলো ম্যাক সত্যি ঘুমাচ্ছে কিনা একবার উঁকি মেরে দেখে যাই। ঢুকে দেখি, নেই। ওষুধের শিশি থেকে কয়েকটা ট্যাবলেট গেরে দিলাম। জাহাজ থেকে নামার আগে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে। কারণ আমাদের জাহাজ থেকে নামতে দেখলে একমাত্র ও-ই চিনতে পারবে। গ্যালিতে ফিরলাম।

কফির জন্যে ডাকলো ম্যাক। ভাবলাম, দিই এখনই ঘুম পাড়িয়ে। যাতে কোনো গোলমাল করতে না পারে। এক কাপে তিনটে দিয়েছি ট্যাবলেট। কেবিনে আমাকে প্রশ্ন করতে করতে পুরো কাপই গিলে নিয়েছে। তারপর থেকেই আল্লাহ্‌কে ডাকছি, কখন ব্যাটা বেহুঁশ হয়।'

'কতোক্ষণ ঘুমাবে? আমরা জাহাজ থেকে নিরাপদে নেমে যেতে পারবো?' অচেতন ম্যাকের দিকে তাকালো সুজা। জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে লোকটা। চেহারায় প্রশান্তি।

'মনে হয় পারবো,' রেজা বললো। 'ও-তো বললো এক বড়ি-তেই পাঁচ ঘণ্টা। তিনটে দিয়েছি, পনেরো না হোক, ঘণ্টা দশেক তো নড়বে বলে মনে হয় না।' ম্যাকের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখলো সে। 'আয়, ধর, ওকে ওর কেবিনে নিয়ে রাখি। বাবুর্চির কাছে জেনেছি, ম্যাক খুবই ঘুমকাতুরে। কাজেই তাকে ঘুমাতে দেখলে সহজে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

ম্যাককে বয়ে নিয়ে যাবার সময় বারান্দায় একজন নাবিকের সঙ্গে দেখা হলো। কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকালো লোকটা।

'অনেক বেশি গিলেছে,' লোকটার দিকে তাকিয়ে সুজা বললো। 'মানা করেছি, শুনলো না।'

'হ্যাঁ,' হাসলো রেজা, 'একেবারে বাতির মতো দপ করে নিভে গেল। আগামী তিন দিন ঘুম থেকে না উঠলেও অবাক হবো না। এখন ওর কাজ আমাদেরই সারতে হবে আরকি। মহা ঝামেলা!'

'ম্যাকের জন্যে এটা নতুন নয়,' লোকটা জানালো। 'গলা পর্যন্ত

গেলে আর মরার মতো ঘুমায়।' তার পথে চলে গেল সে।

'ঝামেলা হবে না মনে হয়,' ম্যাককে বাংকে শোয়াতে শোয়াতে বললো সুজা।

'বুদ্ধিটা কার দেখতে হবে তো,' হেসে বললো রেজা।

'হ্যাঁ, সে তো দেখছিই।'

'চল, ওই দুই ব্যাটার অবস্থা দেখে আসি গিয়ে। ছেড়ে দিলো কিনা কে জানে। তাহলেও অসুবিধে নেই, বেরোতে সাহস করবে না ওরা। অর্ডার নেই বলছিলো না।'

মালখানার দরজা বন্ধ। টোকা দিলো রেজা। ভেতর থেকে সাড়া এলো, 'কে?'

'ম্যাক,' কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নকল করে বললো রেজা।

দরজা খুলে গেল। পিস্তল দেখে চমকে উঠলো লোক দু'জন। আদেশ পালন করে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, দুই হাত মাথার ওপরে।

প্রশ্ন করে জানা গেল, একজনের নাম রিকি, আরেকজন ডন। আসল নাম কিনা বোঝা গেল না; তবে নাম নিয়ে মাথাব্যথা নেই রেজার। সে জানতে চাইলো, 'কোথায় যাচ্ছো জানো? খবরদার, মিথ্যে বলবে না। মিথ্যুকদের একদম সইতে পারি না আমি।'

'না না, মিথ্যে বলবো না,' তাড়াতাড়ি বললো রিকি।

'যা যা জানি সব বলবো,' সুর মেলালো ডন। 'টাকার জন্যে এফাজে এসেছি আমরা। যতো বেশি বেতনই দেয়ার কথা বলুক, মরে গেলে সেটা পেয়ে আর কোনো লাভ হবে না।'

'বাহ্, বুদ্ধিমান লোক,' রেজা বললো। 'বলে ফেলো এবার।'

'খুব বেশি কিছু বলতে পারবো না,' রিকি বললো। 'একটা বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম। বলা হলো, যা দেখবো সে-সম্পর্কে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে যদি ঠিকমতো কাজ করে যাই, ভালো বেতন দেয়া হবে।'

'আমাকেও একই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে,' ডন বললো। 'যারা আমাদের কাজ দিয়েছে, কোথায় পাঠাচ্ছে বলেনি। আগেই বলেছে প্রশ্ন করতে পারবো না, কাজেই করিনি। বললো, মায়ামির কাছে একটা সৈকত থেকে তুলে নেয়া হবে আমাদের দু'জনকে, একটা লিমোসিন গাড়িতে করে। নেয়া হলো। জানালা ছিলো গাড়িটার, কিন্তু এমন কাঁচের কাঁচ, কিছুই দেখা যায় না। ওটাতে করে একটা বড় পুরনো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর লুকিয়ে তুলে দেয়া হলো এই জাহাজে। কড়া নির্দেশ দিয়ে দেয়া হলো, জাহাজে থাকাকালীন কারও চোখে যেন না পড়ি। খাবার আর দরকারী জিনিসপত্র আমাদের দিয়ে যাবে ম্যাক। এর বেশি আর কিচ্ছু জানি না আমরা।'

'বিশ্বাস করো,' রেজার পিস্তলের দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বললো ডন। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে কপালে।

'করা উচিত না, ঠিক আছে, তবু করলাম,' কর্কশ কণ্ঠে বললো রেজা।

'তোমাদের ভাগ্য ভালো আমরা বিশ্বাস করেছি,' সুজা বললো। 'তবে চালাকির চেষ্টা করো না। মরবে, মনে রেখো।'

'না না, কিছু করবো না আমরা,' ডন বললো।

'যা করতে বলবে, তাই করবো,' বললো রিকি।

কথা মতোই কাজ করলো ওরা। দ্রুত ওদের সঙ্গে পোশাক বিনিময় করে ফেললো রেজা সুজা। তারপর আরেকবার বেঁধে ওদের মুখে কাপড় গুঁজে দিলো।

'আমরা কোথায় যাবো ওরা জানে না,' সুজা বললো। 'কাজেই চাইলেও কাউকে পাঠাতে পারবে না আমাদের পেছনে।'

মাথা ঝাঁকালো রেজা। হাই চেপে বললো, 'ঘণ্টা দুই ঘুমানো দরকার। ভোরের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।'

সুজাও হাই তুলতে আরম্ভ করলো। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ডনের ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখবো। পাঁচটায় আমাদের তুলে দেবে।'

'তার আগেই কেউ ঘাড় ধরে না তুললে বাঁচি।'

রিকি আর ডনের ঘরেই রাত কাটাবে ঠিক করলো দুই ভাই। ওপরের বাংকে উঠে গেল সুজা। নিচেরটায় রইলো রেজা।

ওদের মনে হলো, শুয়েও সারতে পারেনি, অমনি পিপ পিপ শুরু করেছে ঘড়ি। কেবিন সংলগ্ন বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে নিলো দু'জনে। ইতিমধ্যে মালখানার বাইরে হৈ-চৈ আর যন্ত্রপাতির আওয়াজ শুরু হয়ে গেল।

'চল, কেউ এসে পড়ার আগেই বেরিয়ে যাই,' রেজা বললো। পিস্তলটা আবার পকেটে ভরতে গিয়েও ভরলো না। গুঁজে রাখলো

নিচের বাংকের গদির তলায়। 'এটা ছাড়াই ভালো। বাবা হামেশাই বলে, পিস্তল সঙ্গে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো, বিপদ কমে। বুলেটের চেয়ে মগজের শক্তি অনেক বেশি।'

'ঠিক,' একমত হলো সুজা। 'তবে পেশীশক্তিও মাঝে মাঝে যথেষ্ট কাজে লাগে। আর সেটা ব্যবহারের ব্যাপারে বাবার আপত্তি নেই।'

সাবধানে দরজা খুলে উঁকি দিলো রেজা। মাল খালাস করায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কয়েকজন লোক। কাঠের খাঁচায় বাক্স তুলে রাখছে। বাক্সশুদ্ধ খাঁচাটা টেনে তুলে ওপরের কারগো হ্যাচ দিয়ে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ক্রেন।

'কোথায় যাচ্ছে আল্লাহ্‌ই জানে!' বিড়বিড় করলো রেজা। ইশারা করলো সুজাকে, বেরোনো এখন নিরাপদ। সবাই কাজে ব্যস্ত, ওদেরকে কেউ লক্ষ্য করবে না।

'শিগগিরিই জানা যাবে সেটা,' সুজা বললো। 'তাড়াতাড়ি চলো ডেকে উঠে যাই কেউ দেখে ফেলার আগেই।'

মিনিট কয়েক পরে ডেকে এসে দাঁড়ালো ওরা। ভোরের আলো সবে ফুটেছে। গভীর একটা খাঁড়ির ধারে নোঙর করেছে ইয়ট। তীরে বিশাল এক ক্রেন ইয়ট থেকে মাল বের করে নিয়ে নামিয়ে রাখছে মাটিতে। খানিক দূরে ঘন জঙ্গল। গাছপালার দেয়ালের মাঝে একটা ফোকর তৈরি করা হয়েছে। বাক্সগুলো বয়ে নিয়ে সেই ফোকরের ভেতরে রেখে আসছে শ্রমিকেরা।

'মাল খালাসের জন্যে এসময়টা কেন বেছে নিয়েছে বুঝতে

পারছি, রেজা বললো। 'কাজ করার মতো আলো আছে, কিন্তু দূর থেকে কেউ সহজে দেখতে পাবে না। সব দিকে কড়া নজর ব্যাটাদের।'

হঠাৎ পেছনে ডাক শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো ওরা। ডাকছে, 'রিকি? ডন?'

কড়া ইস্তিরি করা খাকি পোশাক পরা একজন লোক এসে দাঁড়ালো সামনে। চকচকে পালিশ করা চামড়ার বেল্ট। বেল্টে ঝোলানো হোলস্টারে অধৈর্য ভঙ্গিতে চাপড় দিলো সে। চোখে সানগ্লাস, বৈমানিকেরা যেরকম পরে। কালো কাঁচের আড়ালে চোখ দেখা না গেলেও রেজা সুজার বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের দিকে তাকিয়ে ও'দুটো জ্বলছে। পদবীর চিহ্ন নেই কাঁধে, কিন্তু সে-ই যে এখানকার কমাণ্ডার সেটা স্পষ্ট।

'এতো দেরি করলে কেন?' ধমক দিয়ে বললো লোকটা।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো রেজা। 'সরি, স্যার।'

'আমাদেরকে জাগাতে দেরি করেছে, স্যার,' বললো সুজা।

'তোমাদের কৈফিয়ত শোনার সময় নেই আমার। কার নাম রিকি?'

'আমি রিকি,' রেজা বললো।

'আমি ডন,' বললো সুজা।

'ও-কে। রিকি আর ডন আরও অনেক আছে এখানে। কাজেই তুমি রিকি সেভেন, অর্থাৎ সাত নম্বর রিকি। আর তুমি ডন ইলেভেন। মনে থাকবে?'

'থাকবে, স্যার,' একসঙ্গে বললো দু'জনে।

'এখন মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও, দু'জনেই,' আদেশ দিলো অফিসার।

সাথে সাথে আদেশ পালন করলো ওরা। কার পকেটে কি আছে বের করে নিলো অফিসার।

'গুড,' পিছিয়ে যেতে যেতে বললো সে। হাত নামাতে ইশারা করলো। 'কিছু কিছু লোক কথা শোনে না, অস্ত্র নিয়ে চলে আসে। এখানে সেটা বেআইনী। মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে।'

'আমাদের হবে না, স্যার,' রেজা বললো। 'ওরকম কিছু করবোই না।'

'যা বলবেন তাই করবো,' সুজা বললো। 'একটা কথাও জিজ্ঞেস করবো না।'

'খুব ভালো। তোমাদের নিজেদের জন্যেই ভালো। চলো এখন।'

অফিসারের সঙ্গে গ্যাংওয়েতে নেমে এলো ওরা। জাহাজ আর ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ওটা। তীরে নেমেই কয়েকজন সৈনিককে ইশারা করলো অফিসার। তার মতোই খাকি পোশাক ওদের পরনে। গ্যাংওয়েটা সরিয়ে ফেলতে লাগলো ওরা।

রেজা সুজাকে নিয়ে বনের ফোকরের দিকে রওনা হলো অফিসার। যেখানে মালগুলো নিয়ে ঢোকানো হয়েছে। এখনও আলো কম, বনের ভেতর আরও কম, ছায়া ছায়া অন্ধকারে বেশি দূরে নজর যায় না।

কিছুটা এগোনোর পর ওটা নজরে পড়লো ওদের। একটা ট্রেন। ছোট ডিজেল এঞ্জিন, একটা প্যাসেঞ্জার কার আর পাঁচটা বক্সকার নিয়ে এই রেলগাড়ি।

'অতো চমকে যাওয়ার কিছু নেই,' অফিসার বললো। 'স্বপ্ন না, সত্যিই দেখছো। যাও, গাড়িতে ওঠো।'

যাত্রীবাহী বগিটাতে উঠলো রেজা সুজা। কয়েকটা ছোট ছোট খুপরিতে ভাগ করা, সরু একটা গলিপথ যোগাযোগ রক্ষা করেছে খুপরিগুলোর সঙ্গে। প্রতিটি খুপরিতে ছ'টা করে সীট, তিনটে তিনটে করে মুখোমুখি বসানো।

প্রথম খুপরিটা পেরোনোর সময় দেখলো মার্ক বসে আছে, খাকি পোশাক পরা সৈনিকদের মাঝে। ভাবলেশহীন কঠিন চেহারা লোকগুলোর। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে মার্ক, তার মুখের ঘাম দেখেই আন্দাজ করা যায়।

'খুব মজা তোমাদের,' অফিসার বললো রেজা সুজাকে। 'আস্ত এক কম্পার্টমেণ্ট একলা পেয়ে গেছো। এই ট্রিপে প্যাসেঞ্জার বেশি নেই। আরাম করে বসো। ঘণ্টা দুই পরে র‍্যাঙ্কে গিয়ে দেখা হবে। ওখানেই কাজ বুঝিয়ে দেয়া হবে তোমাদের।'

নীল মখমলের গদিমোড়া সীট, রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মুখোমুখি বসলো দুই ভাই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। চোখে পড়ছে শুধু জঙ্গল। বৃষ্টিভেজা ঘন বন, লম্বা লম্বা গাছ।

জানালার কাঁচের শাটার তুলে নিয়ে গলা বের করলো রেজা। ওপরটা দেখলো। আবার মাথা ভেতরে এনে বললো, 'সাংঘাতিক

চালাক। দুই পাশের গাছের মাথায় জাল বিছিয়ে দিয়েছে, ডাল-পাতা টেনে এনে এমনভাবে লাগিয়ে রেখেছে দেখে মনে হয় স্বাভাবিক। খুব ভালো করে না দেখলে জাল চোখে পড়ে না। ওপর থেকে যাতে লাইন দেখা না যায় সে-জন্যেই এই ব্যবস্থা। একটা সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেলেছে।'

মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করলো ট্রেন।

'রেলগাড়ির কথা বলেছিলো লেমিল, মনে আছে?' রেজা বললো। 'এরকম প্রাইভেট লাইনের কথা শুনেছি আমি। সিভিল ওয়রের আগে দক্ষিণ অঞ্চলে এসব গাড়িতে করে গোলাম পাচার করা হতো। আণ্ডারওয়ার্ল্ড রেলওয়ে বলা হতো ওগুলোকে।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। এটার নাম কি দেয়া যায়? আসামী পরিবহন হলে মন্দ হয় না। তা এই পরিবহন যে কোথায় যাচ্ছে জানতে পারলে হতো।'

আনমনে মাথা ঝাঁকালো রেজা। তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। যতোই এগোচ্ছে, আলো কমছে। এর কারণ ঘন গাছ-পালা। এতোই ঘন, সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। ক্রমশ সুড়ঙ্গের আরও গভীরে ঢুকছে ট্রেন, চলেছে কোন অন্ধকার অচেনা জগতে কে জানে।

দশ

'এই রেল দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছো,' বললো কাউবয় হ্যাট আর খাকি পোশাক পরা লম্বা এক লোক। র‍্যাঞ্চের এক কোণে ট্রেন থেকে নামার পর রেজা সুজার সঙ্গে দেখা হয়েছে লোকটার।

ওদেরকে কেউ বলে দেয়নি, তবু ওদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এই লোকটাই বনের ধারের বিশাল এই আজব র‍্যাঞ্চের সর্বময় কর্তা এবং পরিচালক। সবাই তাকে 'চীফ' বলে ডাকে।

'হ্যাঁ, চীফ,' অন্যদের মতো রেজাও তাকে এই নামেই ডাকলো।

'গল্পটা খুব মজার,' বললো লোকটা। কঠিন দৃষ্টি। হাসার সময়ও একই রকম কঠিন থাকে চোখ দুটো, পরিবর্তন হয় না। রেজা সুজাকে অ্যাটেনশন করিয়ে রেখে ওদের সামনে পায়চারী করতে লাগলো সে। বুঝিয়ে দিতে চাইছে কে এখানকার কর্তা। 'প্রায় নব্বই বছর আগে এটা তৈরি করেছিলো এক আমেরিকান। মধ্য আমেরিকার ছোট ছোট দেশগুলো তখন সিভিল ওয়রে ব্যস্ত,

নিজেরা নিজেরা কামড়াকামড়ি করছে। ওই লোকটা অনুমান করে নিলো, মাথায় ঘিলু থাকলে আর সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকলে যে কোনো আমেরিকান এসে এখানে কর্তৃত্ব করতে পারবে। চলে এলো লোকটা। র‍্যাঞ্চ তৈরি করলো। ঘোষণা করে দিলো এটা একটা স্বাধীন অঞ্চল, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আর এর প্রেসিডেন্ট হলো গিয়ে সে নিজে। সারা জীবনের জন্যে প্রেসিডেন্ট। রেল তৈরি করলো, সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলো যাতে প্রয়োজনীয় মালপত্র আনাতে পারে। কিছুদিন আরামেই কাটালো। তারপর এসব রাষ্ট্রের যা হয় তাই হলো। নাগরিকেরা বিদ্রোহ করে তাকে ধরে বাঁধলো, তারপর গুলি করে মেরে ফেললো। জঙ্গলে বাস করতে না পেরে চলে গেল লোকেরা। র‍্যাঞ্চটা নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। রেললাইনে ঘাস গজালো। এর অনেক দিন পর এলাম আমি। এই জঙ্গলে। ওই প্রেসিডেন্টেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম আমি, শুধু তার মতো বোকামি আর ভুল করলাম না। আমি জানি কি করে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। কি দিয়ে করতে হয়। জানো সেটা কি?'

জবাবের আশায় রেজা সুজার দিকে তাকালো সে।

'বন্দুক,' সুজা বললো।

'ঠিক। ওসব আমি জোগাড় করেছি। তবে বন্দুকের চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র আছে দুনিয়ায়। বলতো সেটা কি?'

'আণবিক বোমার কথা বলছেন?' কণ্ঠের আতঙ্ক চাপা দেয়ার চেষ্টা করলো রেজা।

'না, ওই জিনিসও দরকার নেই আমার। প্রয়োজন পড়লে অবশ্য

জোগাড় করতে পারি। তবে লাগে না,' দাঁত বের করে হাসলো চীফ। 'আমি বলছি টাকার কথা। টাকা এবং তথ্য। এইই আমার দরকার।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকালো দুই ভাই। সবে ভাবতে আরম্ভ করেছিলো ওরা ওদের প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে—কিছু পেয়েছেও, কিন্তু যোগ হলো আরও নতুন নতুন প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, টাকাই সব চেয়ে বড় অস্ত্র,' বলে গেল চীফ। 'সেকথা তোমাদেরকে বোঝানোর দরকার নেই, ভালোই বোঝো তোমরা। নইলে এই জঙ্গলে মরতে আসতে না। টাকার লোভেই এসেছো, তাই না?'

'হ্যাঁ, চীফ,' জবাব দিলো দু'জনে।

'তোমাদের জন্যে খবর আছে। টাকার জন্যে এসেছো বটে, কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত টাকা খরচ করলেও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। মনে রেখো সেকথা। আমার অনুমতি ছাড়া এখান থেকে কেউ বেরোতে পারে না। জীবন নিয়ে অন্তত পারে না। বুঝেছো?'

'বুঝেছি, চীফ,' আবার জবাব দিলো দু'জনে।

'খুশি হলাম। আদেশ পালন করবে, অহেতুক কোনো কিছুতে নাক গলাতে যাবে না, বছর দুই পরে হয়তো আমার বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হবে। বাড়ি ফিরতে পারবে তখন। মনে রেখো, সামান্য একটা ভুলের মাশুল হিসেবেই ছয় ফুট মাটির নিচে চলে যেতে হবে তোমাদের।'

'হ্যাঁ, চীফ,' মাথা ঝাঁকালো রেজা সুজা। কিভাবে বেরোবে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

'বেশ, এখন যেতে পারো।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিলো চীফ। 'মারিয়ানো! এদেরকে নিয়ে গিয়ে কাজ বুঝিয়ে দাও।' বলে আর দাঁড়ালো না সে, গটমট করে চলে গেল।

মারিয়ানো, সেই অফিসার, যে ওদের সঙ্গে ট্রেনে এসেছে, এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো, 'চীফ তার ঐতিহাসিক বক্তৃতা শুনিয়েছে তোমাদের?'

'শুনিয়েছে,' সুজা বললো। 'ঐতিহাসিক বলছেন কেন?'

'আমি ওভাবেই বলি,' এমন ভাবে কথাটা বললো মারিয়ানো, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের, চীফের বড় বড় বুলি তার ভালো লাগে না। আদেশ দিলো, 'এসো, ট্রেন থেকে মাল নামাতে হবে।'

একটা জীপে করে রেজা সুজাকে বক্সকারের কাছে নিয়ে এলো মারিয়ানো। অস্ত্রের বাক্সগুলো ইতিমধ্যেই একটা ট্রাকে তুলতে শুরু করেছে কয়েকজন শ্রমিক।

'যাও, ঘামা আরম্ভ করো,' ছেলেদের নির্দেশ দিলো মারিয়ানো।

তার কথার যথার্থতা কয়েক মিনিটেই হাড়ে হাড়ে টের পেলো ছেলেরা। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম, যেন সেদ্ধ করে ফেলবে। এই এতো উচ্চতায়, পাহাড়ী অঞ্চলে, জঙ্গলের মাথার অনেক ওপরে থেকেও বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না যে এটা মধ্য আমেরিকা। মাথার ওপর যেন আগুন ঢালছে সূর্য, ছ্যাঁকা দিচ্ছে পিঠের চামড়ায়।

বাক্সগুলো ট্রাকে তোলা শেষ হলো। অন্যদের সঙ্গে রেজা সুজাও উঠে বসলো ট্রাকের পেছনে। চলতে শুরু করলো ওটা। ঘন সবুজ, লম্বা ঘাস পরিষ্কার করে তৈরি হয়েছে কাঁচা রাস্তা। ঝাঁকুনি খেতে খেতে চললো ট্রাক। পথের দু'ধারে জমিতে চরছে গরু-ছাগল। কিছুক্ষণ পর পৌঁছলো এসে চওড়া একটা নদীর ধারে। স্রোত খুব কম নদীটায়

সামনের জীপ থেকে নেমে এলো মারিয়ানো। ট্রাক থেকে নামতে বললো সবাইকে। একটা ওয়াকি-টকি বের করে সুইচ টিপলো। ওর কাছে দাঁড়িয়ে আছে রেজা সুজা। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছে সে।

কথা শেষ করে সঙ্গের লোকদের বললো, 'শোনো, আমরা এখানেই থাকবো। ওদের আসতে দেরি হবে না।'

নদীর অন্য পাড়ে তাকালো সুজা। একেবারে তীর থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। 'কারা আসছে?' জানতে চাইলো সে।

'ডাকাত, গেরিলা, মুক্তিযোদ্ধা, যা খুশি বলতে পারো ওদের,' হাত নাড়লো মারিয়ানো। 'ওরা আমাদের প্রহরী। ওদের জন্যেই আমাদের বন্দিরা পালিয়ে বেশি দূর যেতে পারে না। আমরা ওদের অস্ত্র আর গুলি সরবরাহ করি। ওই অস্ত্র নিয়ে কি কি করে ওরা সেটা আমাদের মাথাব্যথা নয়, আমাদের বন্দি পালাতে না পারলেই হলো।'

বজরা আকৃতির দুটো বড় বোট আসতে দেখা গেল। ভটভট ভটভট করছে ওগুলোর আদিম এঞ্জিন। জঙ্গলের ক্যামোফ্লেজ

ইউনিফর্ম পরা দাড়িওয়ালা কয়েকজন লোককে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

বোট দুটো এপারে এসে ভিড়লে মারিয়ানো শ্রমিকদের আদেশ দিলো, 'বাক্সগুলো তুলে দাও।'

রেজা সুজাও কাজে লাগলো। ফিসফিসিয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। 'খুব কড়াকড়ি।' একটা বাক্সের কোণ ধরে তুলতে তুলতে বললো রেজা। 'চারপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর ডাকাতের দল।'

'নিরাপদ ভ্রমণের নমুনা কি!' আরেক ধার ধরে বাক্সটা তুললো সুজা। 'র‍্যাঞ্চটা কি দরকার ওদের? গোটা দুই প্ল্যাস্টিক সার্জারির ডাক্তার হলেই চলতো। যারা পালিয়ে আসে তাদের চেহারা বদলে দিতো, ব্যস।' বাক্সটা নিয়ে একটা বোটে উঠলো দু'জনে। কুৎসিত চেহারার এক ডাকাতের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। বোটে ওঠার পর চুপ থাকলো, তীরে নেমে আবার শুরু হলো আলোচনা।

'কিসের যেন দুর্গন্ধ,' সুজা বললো। 'নদীর পানির না।'

'বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে, যে করেই হোক। বাবা কিংবা বিগম্যানের সঙ্গে কথা বলতে পারলেও চলতো।'

ভ্রূকুটি করলো সুজা। টপ-সিক্রেট একটা সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান বিগম্যান, অবশ্যই এটা তাঁর ছদ্মনাম। কঠিন স্বভাবের লোক। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে রেজা সুজার। বোপোর্টে হলে বাড়ির কমপিউটারের সাহায্যে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা যেতো। কিন্তু এটা বাড়িও নয়, কমপিউটারও নেই।

'তা করা যাবে, বছর দুই পর,' রসিকতা করলো সুজা নিরস

ভঙ্গিতে, 'দেখতে দেখতে উড়ে যাবে সময়টা।'

জবাব দিলো না রেজা।

মাল তোলা শেষ হলে আবার ফিরে চললো বোট দুটো। অন্য-দেরকে ট্রাকে করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে রেজা সুজাকে জীপে উঠতে বললো মারিয়ানো। পেছনে ওদের সঙ্গে সে-ও উঠে বসে ড্রাইভারকে বললো, 'র‍্যাঞ্চ হয়ে ঘুরে যাও। এরা নতুন। ঐতিহাসিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো দেখে রাখুক। বেয়াদবি করবে না আর তাহলে।'

'আচ্ছা, স্যার,' বলে জীপ ছাড়লো ড্রাইভার।

তৃণভূমির পাশ দিয়ে চলার সময় গরুগুলোকে দেখিয়ে বললো মারিয়ানো, 'ওই আমাদের মাংস। চীফ কাউবয় খেলতে পছন্দ করে। ঘোড়ায় চড়ে ল্যাসো নিয়ে বেরোয়, দড়ির ফাঁস দিয়ে গরু ধরে, লোহা পুড়িয়ে ছাপ মারে, পুরনো ওয়েস্টার্নদের মতো।' হাসলো সে। 'তার প্রিয় ঐতিহাসিক শখ।'

আরেকটা কাঁচা রাস্তায় মোড় নিলো গাড়ি। যব, গম আর তর-কারির খেত দেখা গেল।

'বাকি খাবার আসে ওখান থেকে,' জানালো মারিয়ানো। 'এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে চীফ, যাতে খাবারের জন্যে বাইরে যেতে না হয়।'

'কতো লোক বাস করে এখানে?' রেজা জিজ্ঞেস করলো।

'অনেক,' দূরে তাকিয়ে আছে মারিয়ানো। 'বহুদিন ধরে আছে ওরা।'

'খরচ নিশ্চয় অনেক?' ভাইয়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো

সুজা। তথ্য দরকার ওদের, তবে সন্দেহ না জাগিয়ে কতোটা আদায় করতে পারবে মারিয়ানোর কাছ থেকে বুঝতে পারছে না। 'মানে, খাওয়া-দাওয়ায় কেমন খরচ পড়ে যারা থাকে এখানে?'

'খরচ?' দূরে, বনের কিনারে বিশাল একটা এলাকা জুড়ে কতগুলো বাড়িঘর দেখালো মারিয়ানো। 'ওটা র‍্যাঞ্চ হাউস। কোটিপতিরাই কেবল ওখানে থাকতে পারে। একটা ঘরের ভাড়া মাসে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ওই টাকার মধ্যে শুধু নাস্তা দেয়া হবে, আর কিছু না। বাকি সব জিনিসের জন্যে আলাদা বিল। এক বেলা ভালো খেতে চাইলে এক হাজার ডলার। পরিষ্কার চাদর পাঁচশো। ধোপার খরচ হপ্তায় এক হাজার।'

'লোকে কেন দেয় এতো টাকা?' রেজার কণ্ঠে সন্দেহ। 'কতোটা আরামের?'

'আরাম অবশ্যই আছে,' মারিয়ানো বললো। 'তবে সে-কারণে টাকা দেয়না লোকে। পঞ্চাশ লাখ ডলার খরচ হয়ে যায়...'

'পঞ্চাশ লা...,' শেষ করতে পারলো না রেজা, কনুই দিয়ে তাকে গুঁতো মারলো সুজা। হাত তুলে পাশের একটা গম খেত দেখালো। নারী-পুরুষের একটা দল আগাছা সাফ করছে। ওদের কাজের তদারক করছে খাকি পোশাক পরা এক সৈনিক, হাতে রাইফেল। জীপ আরও কাছে এগোলে দেখা গেল, কয়েকজন শ্রমিক স্থানীয়, বাকিরা বিদেশী। মাঝবয়েসী, রোদেপোড়া চামড়া, কাজের ধরন দেখেই বোঝা যায় এসব কাজে অভ্যস্ত নয়। পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, মাথায় জীর্ণ খড়ের টুপি। আগুনের মতো গরম রোদ ঠেকাতে

পারছে খুব কমই ওই কাপড় আর টুপি। হাত যেন আর চলতে চাইছে না ওদের, এতোই ক্লান্ত।

হঠাৎ গুঞ্জন উঠলো। মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে একজন শ্রমিক। উঠে গিয়ে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো তাকে।

ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি ওখানে যেতে বললো মারিয়ানো। কাছে এলে লাফ দিয়ে নামলো সে। পেছনে রেজা আর সুজা।

পড়ে যাওয়া লোকটাকে ধরে বসালো কয়েকজন। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সৈনিক।

লোকটা মাঝবয়েসী। গাল বসে গেছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কতোদিন কামানো হয় না কে জানে। টলটলে নীল চোখের পাশে কালি, প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ।

স্মৃতিতে নাড়া পড়লো রেজার। লোকটাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো। কিন্তু কোথায়, মনে করতে পারলো না।

মারিয়ানো জানে লোকটা কে। বললো, 'নিক, আবার গোল-মাল শুরু করেছো? আর কবে শিখবে তুমি?'

ধাক্কা খেয়ে যেন সোজা হলো লোকটা। রাগে জ্বলে উঠলো, বড় বড় হয়ে গেল নাকের ফুটো, চোখে আগুন। খেতের শ্রমিক আর নয় যেন এখন সে। অভ্যস্ত আদেশের সুরে কথা বলে উঠলো, 'থামো! থামাও ওসব নিক-মিক! আসল নামে ডাকো আমাকে, অন্তত আমার নিজের নামটা শুনতে দাও। আমি ভিকটর সাইমন। যে তোমাকে কিনতে আর বেচতে পারতো দিনে এক লক্ষ বার!'

গায়ে শিহরণ খেলে গেল রেজার। ভিকটর সাইমন! এতোক্ষণে

মনে পড়লো কোথায় দেখেছে ওই মুখ। খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। বিরাট বড়লোক। স্টক মার্কেটে কোটি কোটি ডলার মেরে দিয়েছিলো। ধরা পড়ে পড়ে ঠিক এই সময় একদিন রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়।

ব্যঙ্গ ঝরলো মারিয়ানোর কণ্ঠে, 'নিক, একদিন হয়তো সেটা সত্যি ছিলো। কিন্তু এখন তুমি শেষ। এই র‍্যাঞ্চই এখন তোমার বাড়ি। কেন, পছন্দ হচ্ছে না? আরেকবার ভাগার চেষ্টা করবে? ধরো, পরের বার জঙ্গল থেকে গার্ডেরা আর ফিরিয়ে আনলো না তোমাকে, কিংবা হয়তো খুঁজেই পেলো না। তুমি যেতেই থাকলে, যেতেই থাকলে, যতোক্ষণ না জাগুয়ার অথবা সাপে কামড়ে শেষ করে দিলো তোমাকে। হয়তো বা ওরাও তোমার নাগাল পেলো না, নদী তুমি পেরোলে কিন্তু ডাকাতরা ছাড়বে না তোমাকে, ওদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।'

রেঙ্গা সুজার দিকে ফিরলো মারিয়ানো। বললো, 'শুনেছি আমাদের নিক নাকি পাকা চোর ছিলো। খুব চালাক! অথচ এখানে এতো বোকামি যে কেন করে। টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার পর রান্নাঘরে একটা চমৎকার কাজ দেয়া হয়েছিলো তাকে। বাসন পেয়ালা ধোয়ার চাকরি। রাখতে পারলো না, পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে খোয়ালো। ভেবেছিলো আমেরিকা থেকে পালানোর মতোই বুঝি সহজ এখান থেকে পালানোও।'

'ওকে কি করবো, স্যার?' জিজ্ঞেস করলো সৈনিক প্রহরী।

'কাজ করাও,' আদেশ দিলো মারিয়ানো। যদি মরে যায়, যাবে।

কোথাও যেতে চাইবে না ও, বরং এখানে কাজ করাটাই বেশি পছন্দ করবে, তাই না নিক ? মনে রেখো, আবার গোলমাল করলে খাওয়া অর্ধেক করে দেবো।'

সাইমনের চোখের আগুন নিভে গেল। কণ্ঠস্বরও খাদে নামলো, প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে বললো, 'না না, আর কি কমাবে ? এমনিতেই তো কম। খাবার আরেকটু বাড়িয়ে দিলে আরও ভালো কাজ করতে পারতাম। খুব বেশি চাই না। সামান্য মাখন হলেই চলতো। তাতে রুটিটা স্বাদ লাগতো।'

'বেশ, মন দিয়ে কাজ করো, ভেবে দেখবো,' হাসতে হাসতে বললো মারিয়ানো। 'বলা যায় না, রোববারে খানিকটা মাংসও দিয়ে ফেলতে পারি। কি নিক, এখন আর নিক বলে ডাকলে রাগ করবে না তো ?'

'না না, কি যে বলো, রাগ করবো কেন ?' একেবারে গলে গেল সাইমন। 'বেশি বকে ফেলেছি, কিছু মনে করো না। রোদ, বুঝেছো, রোদে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিলো। এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাংস বললে না ? দিও কিন্তু। এই রোববারেই দিও। তা-ও তো অনেক-দিন অপেক্ষা করতে হবে !'

নিড়ানি তুলে নিয়ে আবার মাটিতে খোঁচা মারলো সাইমন। তার বেঁকে যাওয়া দুর্বল দেহের শক্তিতে যতোটা কুলালো, তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগলো। মুচকি হাসলো মারিয়ানো, জাঁপে এসে উঠলো আবার। রেজা আর সুজাও এসে উঠলো। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে।

'আশা করি বুঝতে পেরেছো,' মারিয়ানো বললো, 'আমরা এখানে কি করে কাজ চালাই।'

'হ্যাঁ,' রাগ চেপে বললো রেজা, 'বুঝেছি।'

'তোমাদেরকে অবশ্য এখানে খাটতে হবে না। র‍্যাঞ্চের হাউস স্টাফ হিসেবে কাজ করবে। সহজ কাজ। থাকার ঘরও ওখানেই পাবে, ব্যারাকে থাকতে হবে না। চলো, সব দেখিয়ে দিই।'

দোতলা একটা পুরনো ধাঁচের বাড়ি, র‍্যাঞ্চ হাউস। চত্বরে পৌঁছে মারিয়ানো বললো, 'কাজটা সহজ, তবে তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাই। চীফের সঙ্গে কাজ করবে তোমরা, মাঝে মাঝে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে সে। তোমাদের আগে যারা ছিলো, তারা বোকামি করেছিলো। তেমন কিছু না, অবাক হয়েছিলো আরকি, আর চীফের নজরে পড়ে গিয়েছিলো সেটা। গন্ধ ছড়াবে তো, তাই লাশদুটো ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে নদীর পাড়ে। কাজেই, ভালো চাইলে দেখেও না দেখার ভান করবে, যা বলা হবে ঠিক তাই করবে।'

সদর দরজায় প্রহরী আছে, তার কাছে রেজা সুজাকে রেখে চলে গেল মারিয়ানো। প্রহরী বললো, 'তোমাদের মালপত্র পরেও নিয়ে গিয়ে গোছাতে পারবে। এখন যাও, চীফ ডাকছেন। জলদি যাও।'

'কোনদিকে?' জানতে চাইলো রেজা।

'ওদিকে। শেষ দরজাটার পরে।'

'কি ভাবছো?' হলরুম ধরে চলতে চলতে বললো সুজা। ঘরটা অনেক চওড়া, উঁচু ছাত। 'মাসে পঞ্চাশ হাজার।'

'খারাপ না,' রেজা বললো। স্প্যানিশ কায়দায় তৈরি সিঁড়ি, দেয়ালে বড় বড় ছবি, অ্যানটিক কার্পেট। 'কিন্তু এতো ভাড়া আদায় করেও এতোবড় একটা প্রতিষ্ঠান এভাবে চালানো সম্ভব না। ভেবে দেখ। ফ্লোরিডার বাড়ি, ইয়ট, প্রাইভেট রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক। ছোট-খাটো একটা রাষ্ট্র চালাতে যতো খরচ তার চেয়ে কম লাগে না।'

'কাণ্ডটা কি করছে দেখছো! কল্পনা করতে পারো, এতো টাকা খরচ করে ভিকটর সাইমন যখন এখানে এসে দেখলো এই অবস্থা, কি রকম রিঅ্যাক্ট করেছে? যে জেলের ভয়ে সে পালিয়ে এলো, তার চেয়ে হাজার গুণ খারাপ অবস্থায় এসে পড়েছে। আহা, নিরাপদ ভ্রমণের কি ছিরি!'

'অন্তত বাঁচিয়ে তো রেখেছে।'

'হ্যাঁ, সেটাই প্রশ্ন। মেরে ফেলে না কেন? যা আদায় করার তো করেই নিয়েছে।' দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবি সামান্য বেঁকে রয়েছে, সোজা করার জন্যে থামলো সুজা। বিখ্যাত এক চিত্রকরের আঁকা।

'হেডকোয়ার্টারে আমাদের ডিউটি পড়ায় সুবিধে হলো,' রেজা বললো। 'অনেক প্রশ্নের জবাব জানতে পারবো।'

'এখুনি একটার জবাব জানতে চাই।'

'কি?'

'মারিয়ানো যে বললো, চীফ মাঝে মাঝে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে, কি বোঝাতে চাইলো? যা দেখলাম এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে?'

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন পেছনের চত্বরের ওদিক থেকে ভেসে এলো মানুষের চিৎকার। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ।

'সুজা,' বিড়বিড় করে রেজা বললো, 'তোর প্রশ্নের জবাব বোধহয় এখনই পেয়ে যাবি!'

এগারো

বিশাল চত্বরের অধিবাসী বলতে আধ ডজন সবুজ কাকাতুয়া, বিশ ফুট উঁচু একটা পাম গাছের ডালে বসে কর্কশ চিৎকার করছে। নানারকম ফুল, গাছপালা, লতায় ছেয়ে রয়েছে চত্বর। অনেক খুঁজে-পেতে নিশ্চয় গহীন জঙ্গল থেকে এনে ওগুলো লাগানো হয়েছে ওখানে। র‍্যাঞ্চ এলাকার মাঝখানে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বন। খুদে বনের মাঝখানে একটা কৃত্রিম ঝর্না।

চমৎকার এই দৃশ্য দেখার মতো মেজাজ নেই এখন রেজা সুজার। আরেকবার বাতাস চিরে দিলো যেন সেই রোম-খাড়া করা চিৎকার। স্পষ্ট বোঝা গেল, চত্বরের ওপাশের বাড়িটা থেকে আসছে। দরজা বন্ধ।

'আয়,' বনের ভেতর দিয়ে ছুটলো রেজা। মাথার ওপরে দ্বিগুণ জোরে চেঁচাতে শুরু করলো পাখিগুলো।

'দাদা, আমরা হয়তো...,' দরজার কাছে পৌঁছে বললো সুজা।

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে আস্তে দরজা সামান্য ফাঁক করলো রেজা। আবার যেন চিৎকারটা এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো ওদের ওপর।

'আমি···আমি বলেছি, আর নেই আমার কাছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো একটা কণ্ঠ।

দ্বিধা করলো রেজা। কণ্ঠটা পরিচিত। তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ভাইকে ইশারা করে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

প্রধান প্রবেশপথের চেয়ে এই জায়গাটা আলাদা। গা শিরশির করে। এটাও হলঘর, প্রথমটার চেয়ে চওড়া অনেক কম, ছাতও খুব নিচু। দেয়ালে ফ্যাকাশে শাদা রঙ। ফ্লোরেসেণ্ট আলো। মেঝে সবুজ।

'হাসপাতালের মতো লাগছে,' ফিসফিসিয়ে বললো সুজা।

হলের শেষ মাথায় একটা দরজা, খোলা, কথা শোনা যাচ্ছে তার ওপাশে। দুটো গলাই পরিচিত। এগিয়ে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো দু'জনে।

ডেন্টিস্ট দাঁত তোলার সময় যেরকম চেয়ারে বসায় রোগীকে, তেমন একটা চেয়ারে বসে আছে মার্ক। কাপড় ছেঁড়া, কাদা লেগে রয়েছে, মুখে কয়েকটা জখম। একটা সুচ ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কব্জিতে, স্যালাইনের প্যাকেটের মতো প্যাকেট ঝুলছে মাথার ওপর।

অন্য লোকটা স্বয়ং চীফ। পরনে সেই থাকি পোশাক, মাথায় কাউবয় হ্যাট, দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারের ওপাশে। কাছেই একটা

টেবিলে রাখা একটা লাই ডিটেক্টর, একটা ভয়েস-স্ট্রেস্ অ্যানালাই-জার, আর কিছু জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেগুলো চিনতে পারলো না রেজা, দেখেইনি কখনও। চীফের হাতে একটা ইনজেক-শনের সিরিঞ্জ, একঘেয়ে কণ্ঠে কথা বলছে মার্কের সঙ্গে। রেজা সুজাকে দেখে থেমে গেল।

মারিয়ানোর সতর্কবাণী মনে পড়লো দু'জনের। অবাক হলেও সেটা চেহারায় ফুটতে দিলো না ওরা। ঘরে ঢুকে অনেকটা সামরিক কায়দায় সালাম জানালো।

'এসে গেছো, গুড,' চীফ বললো, কথায় পশ্চিমা টান স্পষ্ট। 'মার্ককে সামান্য গরম করে নিচ্ছিলাম। টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বলতে লজ্জা পাচ্ছে।'

'আমি বলেছি, আমার কোনো টাকা নেই,' প্রতিবাদ করলো মার্ক। সিরিঞ্জ থেকে চোখ সরাচ্ছে না। 'দোহাই তোমার, বিশ্বাস করো।'

'হ্যাঁ, করছি,' হাসতে হাসতে বললো চীফ। 'এখানে যারাই এসেছে তোমার আগে, জিজ্ঞেস করলে প্রথমে একই কথা বলেছে। সবাই খুব গরীব। এতো গরীব, একটা পয়সা সম্বল নেই কারও। সঙ্গে করে যা এনেছে ওগুলো ছাড়া। চাপ দিলে আস্তে আস্তে কোটিপতি হয়ে যায়। তোমারও একই অবস্থা।'

আই ভি সল্যুশনের লেভেল চেক করলো চীফ। সিরিঞ্জের সুচটা ওপরের দিকে তুলে ধরে আস্তে চাপ দিলো, গড়িয়ে পড়লো এক ফোঁটা নীল তরল ওষুধ। 'আমাদের বেচারা মার্কেরও সেই

অবস্থাই হয়েছে। আশা করেছিলো রাজপ্রাসাদে এনে তোলা হবে। খুবই হতাশ হয়েছে, আহা।' মার্কের খোলা বাহুর দিকে এগোলো চীফ। 'ট্রেন থামার আগেই লাফিয়ে নেমে পালাতে যাচ্ছিলো। গার্ডেরা ধরে ফেলেছে। র‍্যাঞ্চ থেকে পালানোর অপরাধের প্রথম শাস্তি হলো অপরাধীর সমস্ত টাকাপয়সা বাজেয়াপ্ত করা। সেটা করার পর এখন আমাদের মার্ক সাহেবের আর একরাত চলার মতোও সঙ্গতি নেই।'

'স্টেটস থেকে পালানোর আগেই আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছি,' ভাঙা গলায় বললো মার্ক। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে সিরিঞ্জের দিকে, তার ধারণা নিশ্চয় বিষাক্ত কোনো রাসায়নিক পদার্থ ভরা রয়েছে তাতে। 'সব···সঅব দিয়ে দিয়েছি তোমাকে···

'ওটা কোনো টাকাই নয়,' অধৈর্য হয়ে বললো চীফ। 'যাক, এটা দিলে খুব বেশি ব্যথা পাবে না। প্রথমে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ মেরুদণ্ডে, তারপর কাঁপুনি শুরু হবে। র‍্যাটলস্নেকের কামড়ের চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হবে না। এই, ধরো তো ওকে, বেশি নড়াচড়া করে।'

দ্বিধা ঝেড়ে ফেললো রেজা সুজা। এগিয়ে এসে মার্কের কাঁধ চেপে ধরলো। তার চোখে সাহায্যের আকুতি দেখেও দেখলো না। সুচটা এনে ফুলে ওঠা একটা রগের ওপর ধরলো চীফ। চোখাচোখি হলো দুই ভাইয়ের। একে অন্যের মনের কথা পড়তে পারছে। চীফের এই শয়তানী কতোক্ষণ সইতে পারবে ওরা? মার্ক অপরাধী হতে পারে, আদালতে তার বিচার হয়ে যে শাস্তি

হয় হবে, কিন্তু চীফের হাতে এই অত্যাচার চলতে দেয়া যায় না।

চাপ বাড়াতে শুরু করলো চীফ। যে কোনো মুহূর্তে চামড়া ফুটো হয়ে ঢুকে যেতে পারে সুচ। আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়ে গেল সুজা।

'ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমিই জিতলে!' ভয়ে কাঁপছে মার্কের কণ্ঠ। 'আরও কিছু টাকা আছে আমার। সুইস ব্যাঙ্কে। সব দিয়ে দেবো তোমাকে। এখন সরাও সিরিঞ্জটা।'

হেসে পিছিয়ে গেল চীফ। রেজা সুজাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ছেড়ে দিলো মার্কের কাঁধ।

'জানতাম সুবুদ্ধি হবে তোমার,' হেসে বললো চীফ। সিরিঞ্জটা টেবিলে রেখে দিয়ে প্যাড আর পেনসিল তুলে নিলো। 'অ্যাকাউন্ট নম্বরটা বলে ফেলো। একটা মিটমাটে আসতে পারি তাহলে।'

এক মুহূর্ত দেরি করলো না মার্ক। গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল কয়েকটা অ্যাকাউন্ট নম্বর।

'এইই?' শেষ নম্বরটা লিখে নিয়ে বললো চীফ। প্রায় ডজন-খানেক নম্বর, কয়েকটা ব্যাংকের। নাম, চেহারা, বা প্রয়োজনীয় পরিচয় পত্রের দরকার হয়না ওগুলো থেকে টাকা তুলতে, শুধু নম্বর দরকার। 'আশা করি ডোবাবে না আমাকে, মার্ক? নাকি? ভুল নম্বর দাওনি তো?'

'পাগল হয়েছো? টাকাই দুনিয়ায় সব কিছু নয়।'

হাসলো চীফ। ছেলেদের বললো, 'দাও, ওকে খুলে দাও।' দরজার দিকে এগোতে গিয়ে ফিরে তাকালো। 'আমি ভেতরে

গিয়ে টাকা ট্র্যান্সফারের ব্যবস্থা করছি, মার্ক। তুমি গোসল সেরে আরাম করো। ···এই, তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে এসো, পাহারা দিতে হবে।'

অতি-আধুনিক অফিস চীফের, শুধু বুনো পশ্চিমের কয়েকটা ছবি আর একটা লংহর্ন গরুর মাথা বাদে। মাথাটা পেছনের দেয়ালে বসানো, একটা ক্রোম-অ্যাণ্ড-মার্বেল ডেস্কের ওপর।

ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে মার্ককে বসতে দিলো চীফ। দরজায় পাহারা দিতে আদেশ করলো রেজা সুজাকে। 'বসো, আরাম করে বসো,' মার্ককে বললো সে। 'তোমার এই নম্বরগুলো ঠিক আছে কিনা দেখি। এখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে আমাদের, খবর নিতে মোটেই সময় লাগবে না।' পা বাড়িয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো চীফ। 'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাদেরকে অস্ত্র দেয়া হয়নি এখনও। হবে। তার আগে পর্যন্ত এটা দিয়ে কাজ চালাও।'

ডেস্কের কাছের আলমারি থেকে একটা পিস্তল বের করে সুজার দিকে ছুঁড়ে দিলো সে। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের দিকে তাকালো মার্ক। 'আমাকে বেরোতে সাহায্য করবে তোমরা। যা দেবো বলেছিলাম, তার তিনগুণ দেবো, চার গুণ দেবো, যতো চাও ততো দেবো।'

'কোত্থেকে কি দেবেন?' রেজা বললো।

'হ্যাঁ,' সুজা বললো, 'আছেই বা কি আর আপনার? সব তো কেড়ে নিয়েছে চীফ।' চোর চোর খেলাটা এখনো বন্ধ করেনি ওরা। পরিচয় দেয়ার সময় আসেনি।

'কি মনে করেছো ?' ভুরু নাচালো মার্ক, তেজ এখনও কমেনি। 'সব নম্বর দিয়ে দিয়েছি মনে করেছো ? এতোই বোকা ? ভালো করেই জানি, ওর মতো একটা ছ্যাঁচোড় আবার হুমকি দেবে, টাকা চাইবে। যা দিয়েছি এ-তো হাতের ময়লা। কোটি কোটি আছে আমার এখনও।'

'কোটি ?' অবিশ্বাসের ভান করলো রেজা। 'এতো টাকা কি করে কামালেন ?'

'স্রেফ তথ্য বিক্রি করে।' সামনে ঝুঁকলো মার্ক। বেপরোয়া হয়ে গেছে সে, চোখ দেখেই বুঝতে পারলো রেজা। কোণঠাসা করে ফেলেছে তাকে চীফ। 'স্টক মার্কেটের ইনফরমেশন বিক্রি করেছি। বাগে পেয়ে বহু কোটিপতিকে ব্ল্যাকমেল করেছি। পালিয়েছি কেন, বুঝতে পারছো না ? ওরা সব একজোট হয়ে আমার পিছে লেগে-ছিলো। সবাইকে সামাল দিতে পারতাম না।'

দ্রুত ভাবছে রেজা। যেভাবেই হোক বেরিয়ে গিয়ে চীফ আর তার র‍্যাঞ্চের খবর পুলিশকে জানাতে হবে। সঙ্গে করে মার্ককে নিয়ে যেতে পারলে আরও ভালো হয়। তাকেও পুলিশের হাতে তুলে দেবে, যাতে তার বিচার হতে পারে। তাকে চীফের কবলে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

'শুনতে তো ভালোই লাগছে,' বললো সে। 'দেখি আমার দোস্ত কি বলে।'

'বেশি টাকা পেলে আমি রাজি,' সুজা বললো। 'কিন্তু মনে রাখ-বেন, টাকা হাতে না পেলে আপনাকে ছাড়ছি না আমরা। টাকা

দেবেন, তারপরে মুক্তি। ভুলে যাবেন না এটা আমার হাতে আছে,' পিস্তলটা দেখালো সে।

'ওটা আর থাকছে না তোমার হাতে,' চীফ বলে উঠলো। পাঁই করে ঘুরলো সুজা। আরেকটা পিস্তল তার দিকে তাক করে রেখেছে লোকটা। 'তোমার হাতেরটাতে গুলি নেই। কিন্তু এটাতে আছে।'

কি ঘটেছে বুঝে ফেললো রেজা। 'অফিসে বাগ লুকিয়ে রেখেছেন।'

'চালাক ছোকরা,' পিস্তল নেড়ে গরুর মাথাটা দেখালো চীফ। 'আমার কান ওটার মধ্যেই। চালাক বলেই ভুলটা দেরিতে করেছো। যাদের বদলে এসেছো তোমরা, তারা আরও আগেই করেছিলো। ঠিক এই ঘরটাতেই দাঁড়িয়েছিলো ওরা, ভিকটর সাইমনের সঙ্গে কথা বলেছিলো। টাকার লোভ দেখিয়ে ওদেরকেও তোমাদের মতোই পটিয়ে ফেলেছিলো সাইমন। ওদেরকে আর কেউ কোনোদিন দেখবে না। সাইমনেরও আর সাধ্য হবে না কাউকে পটানোর। কানাকড়িও নেই আর ওর। বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই যে সাহায্য পাবে।'

'শয়তান,' বিড়বিড় করলো মার্ক, 'তোমার ব্যবসাই এটা!'

'বুঝেছো তাহলে,' মার্কের ওপর শীতল দৃষ্টি বোলালো চীফ। 'শুধু টাকা দিলেও আর চলবে না এখন, বুঝেছো? যতো লোকের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ছিলো, সবার নাম-ঠিকানা চাই। এরকম একটা র‍্যাঞ্চ চালাতে অনেক টাকা লাগে।'

চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো চেয়ারে নেতিয়ে পড়লো মার্ক।

লাই ডিটেক্টর আর অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মর্ম এতোক্ষণে বুঝতে পারছে সে। বড় বড় পদে আসীন লোকজনকে কায়দায় পেলেই ধরে এনে ইনফরমেশন জোগাড় করে লোকটা। পরাজয় মেনে নিলো সে। কাগজ কলম তুলে নিয়ে খসখস করে লিখতে আরম্ভ করলো।

'ভুলভাল লিখবে না,' হুঁশিয়ার করে দিলো চীফ। 'তুমি কোটি কোটি কামিয়েছো। সেগুলো তো চাইই, আমিও কিছু কামাতে চাই।'

জবাব দিলো না মার্ক। লিখে চলেছে।

'একটা কাজ শেষ হলো,' চীফ বললো, 'এবার তোমাদের পালা।' রেজা সুজার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'খুব মজা হবে। একসময় বেশ ভালো কাউহ্যাণ্ড ছিলাম আমি, অনেক গরু পুষতে হতো, দেখাশোনা করতে হতো সেগুলোর। র‍্যাঞ্চেই বড় হয়েছি আমি, তবে ওটা এর চেয়ে অনেক ছোট ছিলো। ল্যাসো ছুঁড়তে আমি ওস্তাদ। যদি আমার হাত থেকে বেঁচে কোরালের গেট পর্যন্ত যেতে পারো, তোমাদেরকে মাঠে কাজ করার সুযোগ দেবো আমি। আর যদি না পারো, মাঠের সার বাড়াবে তোমাদের মরদেহ। আগের ছোকরা দুটো কোনো কাজের ছিলো না, সহজেই ধরা পড়েছে। তোমরা মনে হচ্ছে অতোটা হতাশ করবে না আমাকে।'

রেজা সুজাকে এমন ভাবে দেখতে লাগলো চীফ, যেন ওরা দু'জন গরু। জবাই করার সময় হয়েছে কিনা বুঝতে চাইছে। 'একজন একজন করে। কে আগে যেতে চাও?'

'আমি,' একই সঙ্গে বললো দু'জনে।

'শোনো, চীফ, আমার দোস্তটা কোনো কাজের না,' রেজাকে বলার সুযোগ দিলো না সুজা। 'একেবারে স্লো। দৌড়াতেই পারে না।'

সাথে সাথে কিছু বললো না চীফ। তাকাচ্ছে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে। অবশেষে মাথা ঝাঁকালো, 'বেশ, বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। তুমিই প্রথমে। দেখি কেমন দৌড়াতে পারো।'

'পারবো,' বুক চিতিয়ে বললো সুজা। 'আমার গায়ে রশিই ছোঁয়াতে পারবে না।'

হাসলো চীফ, খুশি হয়েছে। 'এই তো চাই। অনেক দিন পর সত্যি সত্যি মজা পাবো।' অন্য দু'জনের দিকে তাকালো সে। 'তোমরা থাকো, আমি খেলে আসি।'

সুজার দিকে পিস্তল উদ্যত রেখে তাকে বেরোতে ইশারা করলো চীফ। তারপর নিজেই বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো। হাঁটতে হাঁটতে এলো র‍্যাঞ্চের পেছনের বিশাল কোরালে। ঢেউ টিন দিয়ে তৈরি দেয়াল, ছাত। পাশে একটা আস্তাবল।

'যাও, ঢোকো,' বলে ঠেলে সুজাকে কোরালে ঢুকিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দিলো চীফ। 'মনে হয় না পারবে। তবু, দেখো চেষ্টা করে।'

খানিকক্ষণ দৌড়ঝাঁপ করে শরীর গরম করে নিলো সুজা। বুড়ো আঙুল নেড়ে বললো, 'আমার ওড়ানো ধুলো দেখবে শুধু তুমি, আর কিছু না।'

রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠলো চীফের চোখে। তার পরেও হাসলো। 'সাহস আছে তোমার, ছোকরা। রাগিয়ে দিয়ে সুযোগ বের করতে চাইছো। সেটি হবে না। তবে এই বেয়াদবির জন্যে বাড়তি একটা শাস্তি যোগ হলো তোমার। লোহা পুড়িয়ে তোমার গায়ে নম্বর দেয়া হবে, গরুর মতো।' চোখ সরু করে তাকালো সুজার দিকে। 'ভাবছি, কোন জায়গায় দেয়া যায়? কপালে হলেই ভালো, কি বলো? স্পষ্ট দেখা যাবে। যাও, মাঝখানে যাও। এক মিনিট লাগবে আমার আসতে।'

চীফকে আস্তাবলে ঢুকে যেতে দেখলো সুজা। তারপর ঘুরে পুরো কোরালে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। মাঝখানে যাওয়া, অর্থাৎ আধাআধি দূরত্বই অনেক। আস্তে আস্তে দৌড়াতে লাগলো সুজা। আস্তাবলে একটা ঘোড়া ডেকে উঠলো। হঠাৎ পেছনে গুলির শব্দ হলো।

একটা প্যালোমিনো ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এসেছে চীফ। হাতে পিস্তল, ওপরের দিকে তুলে গুলি করেছে, অর্থাৎ খেলা শুরু। বাঁ হাতের কাছে জিনের শিং-এ ঝোলানো রয়েছে ল্যাসোটা। পিস্তল-টা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে চাপড় দিলো ঘোড়ার পিঠে। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলো ঘোড়া। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো চীফ, গরু তাড়া করার সময় যেমন করে।

প্রাণপণে ছুটলো সুজা, যতোটা জোরে সম্ভব। বুকের খাঁচায় এতো জোড়ে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, মনে হচ্ছে পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। ফেটে যাবে যেন ফুসফুস। দ্রুত এগিয়ে আসছে গেট।

আর বেশিদূর এগোতে পারলো না। কাঁধের ওপর পড়লো ল্যাসোর দড়ি। শক্ত হতে আরম্ভ করলো ফাঁস।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো চীফ, 'হেরে গেছো তুমি, ছেলে! মরবে এবার!'

বারো

এর অপেক্ষাতেই ছিলো সুজা।

দাঁড়িয়ে গেল আচমকা। চোখের পলকে দড়িটা দু'হাতে চেপে ধরে গায়ের জোরে হ্যাঁচকা টান মারলো। মনে মনে প্রার্থনা করলো : খোদা, দেরি যেন না হয়ে যায়! ঘোড়াটা যেন গায়ের ওপর এসে পড়তে না পারে!

সফল হলো সে। জীবন বাজি রেখে জুয়া খেলছিলো, জিতে গেল। ল্যাসোটা হাত থেকে ছাড়ারও সময় পেলো না চীফ। কল্পনাই করতে পারেনি এরকম কিছু একটা ঘটবে। দড়ির একমাথা পেঁচানো রয়েছে তার হাতে। গতিবেগ সামনের দিকে। টানের চোটে ডিগবাজি খেয়ে পড়লো ঘোড়ার পিঠ থেকে, একেবারে মাটিতে।

পিস্তল বের করারও সুযোগ পেলো না সে, তার আগেই টান দিয়ে হোলস্টার থেকে ওটা বের করে নিলো সুজা। সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে ঝাড়া মেরে ঢিল করলো দড়ির ফাঁস। কাঁধের ওপর থেকে শরীর গলে ঝপ করে খসে পড়লো ওটা মাটিতে। 'ও-কে, চীফ, ওঠো এবার। খেল খতম সত্যিই। তবে তোমার। মাথার ওপর হাত তুলতে যদি ইচ্ছে না হয় তো নিজেই চলে যাও আকাশে।'

পিস্তলের ভয়ঙ্কর মুখের দিকে তাকিয়ে আদেশ পালন করলো চীফ। হিংস্র নেকড়ের চোখের মতো ধকধক করে জ্বলছে চোখ। 'পালাতে পারবে না তুমি, মনে রেখো,' দাঁতে দাঁত চেপে বললো সে। 'এর সাজা তুমি পাবে।'

'কথা না শুনলে তোমার বেলায়ই ঘটবে সেটা,' চীফের কপাল বরাবর পিস্তল ধরলো সুজা। 'বিশ্বাস করো...'

সুজার চোখের দিকে তাকিয়ে তার কথা বিশ্বাস করলো চীফ। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তুলছি। সাবধান, হেয়ার ট্রিগার। একটু জোরে চাপ লাগলেই গুলি বেরিয়ে যাবে।'

'চমৎকার, ভালোই হলো তাহলে। এমন কিছু করবে না যাতে জোরে চাপ লেগে যায়।'

কোথায় যেতে হবে বলতে হলো না চীফকে। গেট খুলে কোরাল থেকে বেরোলো সে। অফিসে চললো। না বলতেই ওটারও দরজার তালা খুলে দিলো।

দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গেল মার্ক। রেজা হাসলো। 'যাক, পেরেছিস। এই দোয়াই করছিলাম।'

'কিভাবে যে ধুড়ুস করে পড়লো, দেখোইতোনি,' হেসে বললো সুজা। 'মিস করেছো।'

'ভালোমতো ভেবে দেখো একটা কথা,' সাবধানে বললো চীফ, যাতে রেগে গিয়ে সুজা না আবার গুলি করে বসে এই ভয়ে; 'বাঁচতে পারবে না এসব করে। পালাতে পারবে না। চারপাশে জঙ্গল। যতো বেশি সময় আমাকে আটকাবে, ততোই বেশি রেগে যাবো আমি, শাস্তির পরিমাণ বাড়বে। কাজেই ওসব বাদ দিয়ে···

'ও ঠিক কথাই বলছে,' মার্ক বললো। 'একটা রফা করতে পারি আমরা।'

'শিক্ষা আর হবে না আপনার, তাই না?' ধমক লাগালো সুজা 'সাপের সঙ্গে রফা হয় না কখনও। এটা কেউটের চেয়েও খারাপ।'

'তাছাড়া রফা করতে যাবোই বা কেন আমরা,' রেজা বললো, 'লাইন যখন আছে?'

আন্দাজ করে ফেললো সুজা, কোনো একটা বুদ্ধি বের করে ফেলেছে তার ভাই।

'লাইন?' বুঝতে পারলো না মার্ক।

'রেললাইন,' বুঝিয়ে দিলো রেজা। 'ওপথে এসেছি, ওই পথেই বেরিয়ে যাবো।'

সুজা বুঝে ফেললো। চীফের দিকে পিস্তল নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ, টিকেট আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'কি করে ভাবলে···,' শুরু করলো চীফ, শেষ করতে পারলো না।

রেজা বললো, 'ভাবাভাবির কিছু নেই এতে, আমরা জানি। আমরা জানি, এখুনি ফোন তুলে ট্রেনটা রেডি করতে বলবে। এ-ও

জানি, তোমার সমস্ত মেহমানকে জড়ো করে বক্সকারে তোলার আদেশ দেবে তোমার গার্ডদের। আরও জানি, তোমাকে আর আমাদেরকে নিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ছাড়বে ট্রেন। ওতে থাকবে প্রয়োজনীয় খাবার দাবার, যাতে ইয়টটা আবার আসতে আসতে খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকতে পারি আমরা সবাই। নিয়মিত আসে ওটা, আবারও মাল নিয়ে আসবে, তাই না? ওতে করেই আমেরিকায় ফিরে যেতে পারবো আমরা সবাই।'

'কি করে জানলাম, বলতো?' রেজা থামলে সুজা বললো। 'জানলাম, কারণ, এসব যদি না করো খুব তাড়াতাড়ি কবরে চলে যাবে তুমি।'

পিস্তলের দিকে তাকালো চীফ, সুজার মুখের দিকে, তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো রিসিভার।

তিনবার ফোন করলো সে। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরালো না পিস্তলের ওপর থেকে। প্রথমবার করে ট্রেন রেডি করার নির্দেশ দিলো। দ্বিতীয়বারে মেহমানদের এনে বক্সকারে তোলার জন্যে। আর তৃতীয়বার করলো, সকলের চারদিন যাতে চলে এই পরিমাণ খাবার আর পানি নেয়ার জন্যে।

ওর লোকেরা যখন জানতে চাইলো, গার্ড ক'জন যাবে, পিস্তলের দিকে তাকিয়ে 'না' বলে দিলো সে। বললো তার সঙ্গে শুধু নতুন দুটো ছেলে যাবে। তাতেই যথেষ্ট।

একটিমাত্র প্রশ্নই করা হলো তাকে। এর বেশি করার সাহসই করলো না কেউ। কারণ সবাই জানে প্রশ্ন করা একদম পছন্দ করে

না চীফ। ওরা শুধু আদেশ পালন করতে অভ্যস্ত।

সাহস ফিরে পেয়েছে আবার মার্ক। বললো, 'দারুণ দেখিয়েছো হে তোমরা। ফিরে গিয়েই তোমাদের পাওনা আর বোনাস পেয়ে যাবে। কথা দিলাম। আরও এক কাজ করতে পারো, তোমাদের পাওনা আমার কাছে রাখতে পারো। আমি ব্যবসায় খাটিয়ে তোমাদের ধনী বানিয়ে দেবো।'

'থ্যাংকস। ভেবে দেখবো,' রেজা বললো। হাসি চাপতে কষ্ট হলো তার। এই পরিস্থিতিতেও ভাঁওতাবাজি ছাড়তে পারেনি মার্ক, স্বভাব।

'হ্যাঁ,' মার্কের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো সুজা, 'আপনাকে বিশ্বাস না করলে আর কাকে করবো? এরকম একজন সৎ লোকই তো খুঁজছিলাম টাকা দেয়ার জন্যে।'

'থাক থাক, তোমাদের টাকা তোমরা যা খুশি করো, ভালো বুদ্ধি দিয়েছিলাম...,' মুখ কালো করে বললো মার্ক। 'আচ্ছা, একটা কথা বুঝতে পারছি না। আমাকে নিচ্ছো নাহয় টাকার জন্যে, অন্যদের নিচ্ছো কেন? ওদের কারো কাছে কিছু নেই। অহেতুক ঝামেলা বাড়াচ্ছো।'

'কে জানে, লুকানো টাকা আছে কিনা। সবাইই তো আপনার মতো ভালোমানুষ, নইলে কি আর এখানে এসেছে?' রেজা খোঁচাটা দেয়ার লোভ সামলাতে পারলো না।

'ঠিক আছে, তোমাদের ব্যাপার এটা, যা ভালো বোঝো করো।'

এই মুহূর্তে নিজেদের পরিচয় ফাঁস করতে চাইলো না রেজা।

অপরাধীদের নিয়ে গিয়ে আইনের হাতে তুলে দিতে চায়, একথা জানলে বেঁকে বসতে পারে ওরা। বিপদে পড়ে যাবে তখন। তবে মার্কের ব্যাপারে জানার এইই সুযোগ। 'নিরাপদ ভ্রমণের নিরাপত্তা যে কতোখানি, সে তো বুঝতেই পারছেন,' বললো সে, 'আর নামের ন্যাকামি করে কি লাভ? আপনার আসল নাম নিরাপদে বলতে পারেন এখন। বানানোটা শুনতে বিরক্তি লাগছে আমার।'

'আমারও,' মার্ক বললো। তৈলাক্ত হাসি হাসলো। 'নিশ্চয় আমার নাম শুনে থাকবে, কাগজে অনেকবার বেরিয়েছে। আমি হেস, টেরিয়ানো হেস।'

ঝট করে পরস্পরের দিকে তাকালো দুই ভাই। এই তাহলে টেরিয়ানো হেস, মিস্টার ডেভিড কুপারের বস্। ডবসির বাবাকে ফাঁদে ফেলে দিয়ে নিজে চোরাই মাল নিয়ে উধাও হয়েছিলো।

'টেরিয়ানো হেস?' ভুরু কুঁচকে মনে করার ভান করলো রেজা। 'পড়েছি মনে হয়। আপনিই তো টাকা নিয়ে গায়েব হয়েছিলেন, ধরা পড়েছে আপনার সহকারী···কি যেন নাম···'

'কপার না কাপুর এরকম কি যেন নাম,' সুজা বললো।

'কুপার,' হেস বললো, 'ডেভিড কুপার। খুব নীতিবান দেখায় নিজেকে। দিয়ে এসেছি ফাঁসিয়ে। এমন কায়দা করে রেখে এসেছি, পুলিশ বিশ্বাস করে বসে আছে চুরিটা আসলে কুপারই করেছে, তারপর আমাকে খুন করেছে মুখ বন্ধ করার জন্যে। আমার একজন লোক দিয়ে এক ব্যাগ টাকাও লুকিয়ে রেখে এসেছি তার বাড়ির আলমারিতে, সে পালানোর পরিকল্পনা করেছিলো এটা বোঝানোর

জন্যে। ও এখন জেলে পচছে, আমি মুক্ত পাখি। আমার বুদ্ধির প্রশংসা অবশ্যই করবে তোমরা।'

'তা করবো। শেয়ালেরাও টের পেলে আপনার মুরীদ হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যাবে,' রেজা বললো।

ফোন বাজতে আরম্ভ করলো। রিসিভার তুলে নীরবে শুনলো চীফ। রেখে দিয়ে বললো, 'সব রেডি।'

'চলো তাহলে,' সুজা বললো। 'বেরোও। আবার হুঁশিয়ার করছি, কোনোরকম শয়তানী চাই না। করলেই মরবে। আমরা তো এমনিতেই শেষ, জানের পরোয়া যে করি না বুঝতে পারছো নিশ্চয়।'

মাথা ঝাঁকালো চীফ।

সুজার আগে আগে বেরোলো সে। ডানে বাঁয়ে কোনোদিকে তাকালো না, সোজা এগোলো র‍্যাঞ্চের গেটের দিকে। পাশ দিয়ে প্রহরীরা যাবার সময়ও ওদের দিকে তাকালো না সে। সোজা গিয়ে উঠে বসলো অপেক্ষমাণ জীপে। পাশে উঠে বসলো সুজা। সূর্য ডুবে গেছে। বিশাল চাঁদ উঁকি দিয়েছে পুব দিগন্তে, আর খানিক পরেই এই বুনো অঞ্চলকে জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যেন।

ট্রেনের কাছে এসে থামলো জীপ। চাঁদের আলোয় কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে ট্রেনটাকে। একটামাত্র আলো জ্বলছে ভেতরে। কড়া প্রহরা।

একঝাঁক প্রহরী নিয়ে অপেক্ষা করছে মারিয়ানো। জীপের

দরজা খুলে দিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালো। নেমে ট্রেনের দিকে এগোলো চীফ। পেছনে সুজা। তার পেছনে রেজা আর মার্ক।

'আরি, মার্ক, তুমি কোথায় যাচ্ছো?' ধমকে উঠলো মারিয়ানো। 'তুমি বক্সকারে ওঠো, অন্য বন্দিদের সাথে।'

প্রতিবাদ করার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল হেস। 'ভুল হয়ে গেছে, স্যার।'

প্যাসেঞ্জার কারে ঢুকলো চীফ আর রেজা সুজা। পেছনে মারিয়ানো।

'আর কিছু করতে হবে, চীফ?' মারিয়ানো জিজ্ঞেস করলো।

সুজার কঠিন দৃষ্টির ওপর ঘুরে এলো চীফের নজর। তারপর মারিয়ানোর দিকে চেয়ে বললো, 'না, তুমি যাও। এঞ্জিনিয়ারকে ট্রেন ছাড়তে বলো।'

মারিয়ানো চলে যাওয়ার পরও চুপচাপ রইলো রেজা সুজা। ট্রেন চলতে শুরু করলে বললো সুজা, 'বোকা নও তুমি, চীফ। মরতে চাও না বোঝা যাচ্ছে। আরে এতো রাগ করছো কেন? জেলে থাকতে খুব একটা খারাপ লাগবে না। আর থাকবেই বা কদিন, বিশ-তিরিশ বছরের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে।'

'তুই···,' সুজা পকেট থেকে পিস্তল বের করতেই থেমে গেল চীফ।

'জায়গা বদলের সময় হয়েছে,' রেজা বললো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলো র‍্যাঞ্চের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছে কিনা ট্রেন। 'চলো, এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

চীফকে আগে আগে রেখে প্যাসেজ ধরে এগোলো দু'জনে। প্যাসেঞ্জার কারের শেষ মাথায় একটা দরজা, এঞ্জিনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ওটার।

অটোম্যাটিক কন্ট্রোলে চলছে এখন ট্রেন। সীটে বসে ঝিমুচ্ছে ড্রাইভার। তার কাঁধে টোকা দিলো রেজা। চোখ মেলে চীফকে দেখে লাফিয়ে উঠলো সে। 'কিছু না, স্যার, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। আর হবে না এরকম...'

এই সময় সুজার হাতের পিস্তল চোখে পড়লো তার।

'একটা উপকার করো আমাদের,' সুজা বললো, 'ট্রেন কিভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দাও। নিজেদের যোগ্যতা পরখ করে নিই।'

আধ ঘণ্টা পর প্যাসেঞ্জার কারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলো চীফ আর এঞ্জিনিয়ার। ট্রেন চালাচ্ছে রেজা সুজা।

'সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ছে বলে নিশ্চয় মন খারাপ করে আছে হেস,' ট্রেনের গতি বাড়ানোর জন্যে একটা লেভারে চাপ দিলো সুজা। 'বাহ্, চালাতে বেশ মজা তো। ছেলেবেলায় ট্রেন দেখলেই চালাতে ইচ্ছে করতো আমার।'

'চালাও এখন চুটিয়ে,' রেজা বললো। 'তবে মাথা গরম যেন না হয়ে যায়।'

'তুমি আমাকে চেনো,' গতি আরও বাড়ালো সুজা।

'ভয় তো সে-জন্যেই। এতো কষ্ট করে বেঁচে এসে শেষে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মরতে চাই না।'

'মরবে না। সামনে লাইন একেবারে পরিষ্কার। ওদিক থেকে

ট্রেন আসারও ভয় নেই।'

তর্ক করলো না রেজা। গাছের সুড়ঙ্গে ট্রেন ঢুকলে হেডলাইট জ্বেলে দিলো। চকচক করে উঠলো লাইন। আলোর শেষ মাথায় কালো অন্ধকার।

চোখ ডললো সুজা। 'নাহ্, যতো সহজ ভেবেছিলাম ততো সহজ নয়। ট্রেন চালানোও বেশ কঠিন, ওই লাইনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসে যায়। তাছাড়া বেপোর্ট ছাড়ার পর তো আর ঘুমানোর সুযোগ পাইনি তেমন।'

'ঠিকই বলেছিস,' রেজা বললো। 'আর বেশি নেই। প্রায় এসে গেছি।' হাই তুললো সে। হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল চোখ। চেঁচিয়ে উঠলো, 'জলদি, জলদি ব্রেক কর!'

বলার দরকার ছিলো না। সুজাও দেখতে পেয়েছে। লাইনের ওপর পড়ে রয়েছে বড় বড় গাছ। ব্রেক করার লেভার ধরে জোরে টান মারলো। লাইনের সঙ্গে চাকা ঘষার প্রচণ্ড শব্দ, ভীষণ ঝাঁকুনি, মনে হলো লাইন থেকেই বুঝি পড়ে যাবে গাড়ি। পড়লো না। ধাক্কাও লাগলো না গাছের সাথে। থেমে গেল শেষ মুহূর্তে।

'চল তো দেখি···,' বলেই থেমে গেল রেজা।

কিভাবে গাছ পড়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। জানালার নিচে চোখ পড়তে দেখলো হাতে মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়ানো।

অন্ধকার থেকে ভেসে এলো একটা কণ্ঠ, ছেলেদের পরিচিত। 'হাল্লো। দেখা হয়ে গেল আবার!'

তেরো

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। মেশিনগান তাক করে রেখেছে সুজার মাথার দিকে। 'লেমিল!' বিড়বিড় করলো সুজা। 'তুমি এলে কি করে?'

'এই চলে এলাম,' হাসতে হাসতে বললো লেমিল। 'চালাক গোয়েন্দা তোমরা, তোমাদেরকেও বুঝিয়ে বলতে হবে? আন্দাজ করতে থাকো। র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অনেক সময় পাবে। তারপরেও যদি বুঝতে না পারো, চীফই তোমাদের বলবেন, খতম করে দেয়ার আগে।' চওড়া হলো তার হাসি। 'তখন আমি কাছে থাকতে চাই। দেখে খুব মজা পাবো।'

আধ ঘণ্টা পর আবার র‍্যাঞ্চে ফিরে এলো ওরা। পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে লেমিল, মারিয়ানো আর কয়েকজন গার্ড। হেলিকপ্টারে করে। এটা নিয়েই উড়ে গিয়েছিলো দলটা, ট্রেন আটকানোর জন্যে। ট্রেন আর বন্দিদের নিয়ে আসার জন্যে কিছু লোক

রয়ে গেল ট্রেনে।

চীফের অফিসে ঢুকে লেমিল জিজ্ঞেস করলো, 'বুঝতে পেরেছো কিভাবে এসেছি?'

ফেরার পথে অনেক ভেবেছে রেজা। বললো, 'নিশ্চয় কোনো ধরনের ইমারজেন্সী প্ল্যান রয়েছে তোমাদের, যদি কেউ সিকিউরিটি শীল্ড ভেদ করে ঢুকে পড়ে, এ-জন্যে। বাড়তি সতর্কতা। আগেই ভাবা উচিত ছিলো আমার। আমাদের মতো একই কাজ আরও কেউ করতে পারতো, এটা ভেবে ব্যবস্থা না নিয়ে রাখার মতো বোকা নয় চীফ।'

'এই তো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছো এখন,' চীফ বললো। 'তবে কপাল খারাপ তোমাদের, বুঝতে বেশি দেরি করে ফেলেছো। ম্যাক গর্দভটা জেগে উঠেই দেখলো তোমরা নেই, মালখানায় গিয়ে দেখলো অন্য গাধা দুটো হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছে। গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জানালো সে। ক্যাপ্টেন গিয়ে তার আলমারি খুলে একটা সিল করা খাম বের করলো, ওরকম জরুরী অবস্থায় ওটা খুলে দেখার অর্ডার আছে তার ওপর। ওটাই আমার সিকিউরিটি শীল্ড। তাতে একটা ফোন নম্বর আছে। লেমিলের নম্বর। কাছে যে দ্বীপটা পেলো তাতেই ভিড়ে লেমিলকে ফোন করলো সে। আর কি, চলে এলো লেমিল।'

'সবই চীফের বুদ্ধিতে হয়েছে। একেবারে নিখুঁত ব্রেন,' নির্লজ্জের মতো প্রশংসা করলো লেমিল। 'আগে থেকেই কি সুন্দর সব ভেবে রেখেছেন। ক্যাপ্টেনের ফোন পেয়ে আমিও আমার সিল করা

খাম খুল্লাম। র‍্যাঞ্চে উড়ে আসার ফ্লাইট প্ল্যান রয়েছে তাতে। সাথে সাথে কোম্পানির একটা হেলিকপ্টার নিয়ে উড়ে চলে এলাম। শুনলাম, রিকি আর ডন নামে দু'জন নতুন রিক্রুটকে নিয়ে চীফ চলে গেছে ট্রেনে করে, সঙ্গে নিয়ে গেছে বন্দিদের। সন্দেহ হলো। হেলিকপ্টার বোঝাই করে লোক নিয়ে চলে গেলাম সাগরের পাড়ে।' উরুতে চাপড় মারলো সে, আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছে না যেন। 'চেহারা যা হয়েছিলো না তোমাদের, মনে রাখার মতো। যেন ভূত দেখেছিলে।'

'এবং এখন আমরা সবাই দেখবো ওদের চেহারা,' চীফ বললো। উপভোগ করছে সে-ও। 'মেরে ফেলা হবে তোমাদের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাথার পেছনে দুটো করে গুলি, ব্যস। তবে সেটা অনেক পরে। আমাকে ভুগিয়েছো তো, তোমাদের শরীর থেকেও খানিকটা ঘাম ঝরানোর ব্যবস্থা করবো।'

কাউবয় হ্যাটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো চীফ। এগিয়ে এলো ছেলেদের দিকে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কঠিন কণ্ঠে বললো, 'আসলে ঘাম নয়, রক্ত ঝরতে দেখতে চাই আমি তোমাদের শরীর থেকে।'

ছেলেদের মুখ শক্ত হয়ে যেতে দেখে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলো সে। 'কিভাবে ঝরাবো, সেটা এখন বলবো না। ভাবো, সারারাত ধরে ভাবো আর ঘামো। কাল সকালে অবাক করে দেবো তোমাদের, আমার আবিষ্কার দেখিয়ে। দেখি কতোটা সহ্য করতে পারো।'

প্রহরীদের দিকে ফিরলো সে। 'যাও, গরম ঘরে নিয়ে ভরো।'

গরম ঘর হলো জানালাবিহীন শাদা রঙ করা একটা ঘর। কোনো আসবাবপত্র নেই। এমনকি একটা সাধারণ চারপায়া কিংবা চেয়ারও না। নিচু ছাত থেকে ঝুলছে পাঁচশো ওয়াটের একটি বাতি। এতো পাওয়ারের বাতি পাথরের মেঝে আর ইস্পাতের দরজায় প্রতিফলিত হয়ে যেন তন্দুর বানিয়ে ফেলেছে খুদে ঘরটাকে।

দরদর করে ঘাম ঝরছে সুজার কপাল বেয়ে। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বললো, 'আরিব্বাপরে! একশো ডিগ্রির কম হবে না গরম!'

রেজাও একই রকম ঘামছে। বললো, 'হ্যাঁ। এক ফোঁটা পানিও দিয়ে যায়নি ব্যাটারা।'

'তারমানে জলদি বেরোতে হবে এখান থেকে। কিন্তু কিভাবে?'

বলতে গিয়েও থেমে গেল রেজা। ঠোঁটে আঙুল রেখে বুঝিয়ে দিলো নীরবে কাজ করতে হবে। ওদের পরিকল্পনা চীফ শুনে ফেললে মুশকিল হয়ে যাবে। ভাবার জন্যে বসে পড়লো মেঝেতে। ভাবছে, আর ঘামছে।

সুজা এতো চুপচাপ থাকতে পারলো না। অস্থির স্বভাব তার, আরও অস্থির হয়ে উঠেছে কিছু একটা করার জন্যে। ঘুরে ঘুরে পায়চারী করতে লাগলো সারা ঘরে। অবশেষে বসে পড়লো ভাইয়ের পাশে। ফিসফিসিয়ে বললো, 'এই বাক্স থেকে বেরোই কি করে? দরজা, দেয়াল, মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি দেখেছি। মনে হয় এই-

বার ঠেকিয়ে ফেলেছে আমাদের।'

রেজা বললো, 'শক্তি খরচ না করে চুপচাপ থাকি। উপায় বেরিয়েও যেতে পারে।'

'দাদা, চুপ করে থাকতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু রুটি-সেঁকা হতে চাই না আমি মোটেও। ওই বাতিটা অন্তত ভেঙে ফেলা দরকার। নইলে কাল সকালে এসে দুটো বদ্ধ উন্মাদকে পাবে ওরা।'

দেয়ালের কাছে পিছিয়ে গেল সুজা। তারপর দিলো দৌড়। বাতিটার নিচে এসে লাফিয়ে উঠলো বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের মতো। এক লাফেই ধরে ফেললো মোটা লোহার বীম, যেটার কাছে ঝুলে আছে বাতি। চামড়া-ঝলসানো তাপের তোয়াক্কা না করে হাত বাড়ালো বাল্বের দিকে। ঘুসি মেরে ভেঙে ফেলবে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রেজা। 'দাঁড়া, দাঁড়া!'

ভুরু কুঁচকে ভাইয়ের দিকে তাকালো সুজা। 'জলদি বলো! কাবাব হয়ে যাচ্ছি! ছেড়ে দিলাম কিন্তু হাত!'

'তারটা বেশ লম্বা মনে হচ্ছে,' রেজা বললো।

বুঝে ফেললো সুজা। 'রাইখের ইয়ট থেকে বেরোতে যা করেছিলাম?'

মাথা ঝাঁকালো রেজা।

বাল্বের সকেটের ওপরের তার ধরে টান দিলো সুজা। চড়চড় করে খসে আসতে লাগলো সরু কাঠে আটকানো তার। নিচে নামিয়ে দিলো সে। রেজা যখন ওটার নাগাল পেলো, বীম ছেড়ে লাফিয়ে নামলো সুজা।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল অপারেশনে যে কায়দা করে ইয়টের বন্ধ ঘর থেকে মুক্তি পেয়েছিলো ওরা, ঠিক সেই একই কায়দা করলো এখানেও। বাল্ব খুলে সকেটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে খোলা তারের মাথা নিয়ে গিয়ে ইস্পাতের দরজায় লাগাতে তৈরি হয়ে দাঁড়ালো রেজা।

'আনবো কিভাবে ওদের?' সুজা জিজ্ঞেস করলো।

'চেঁচানো শুরু কর,' রেজা বললো। 'কিছু জিজ্ঞেস করলে একটা গপ্পো বানিয়ে বলবি।'

চেঁচাতে শুরু করলো সুজা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে সাড়া দিলো একটা ভোঁতা মোটা কণ্ঠ, 'এই, কি হয়েছে?'

'আমার ভাই মারা যাচ্ছে! বাল্ব ভাঙতে গিয়ে কারেন্টের শক খেয়েছে!'

'মারা যাচ্ছে!'

'হ্যাঁ। মরে গেলে তোমাকে আস্ত রাখবে না চীফ। নিশ্চয় বলে দিয়েছে, যাতে আমরা না মরি সেদিকে খেয়াল রাখতে। কারণ সে নিজের হাতে মারবে...'

'দরজার কাছ থেকে সরে যাও,' লোকটা বললো, 'দরজা খুলছি।'

তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ হলো। ফাঁক হতে শুরু করলো দরজা। কব্জা ক্যাঁচ করে উঠতেই তারের মাথা চেপে ধরলো রেজা। ঝিলিক দিয়ে উঠলো বিদ্যুতের নীল স্ফুলিঙ্গ। বাইরের লোকটা চিৎকার করারও সুযোগ পেলো না। গোঁ গোঁ করে উঠে উল্টে পড়ে গেল।

তারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো রেজা।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো সুজা। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস যেন শরীর জুড়িয়ে দিলো ভয়াবহ ওই নরক থেকে বেরোনোর পর।

অচেতন লোকটাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল ওরা। শার্ট ছিঁড়ে হাত-পা বাঁধলো, মুখে কাপড় গুঁজে দিলো। দরজা লাগিয়ে চাবি দিয়ে দিলো। অনেকগুলো চাবি আছে রিঙটায়, কাজে লাগতে পারে ভেবে ফেললো না রেজা, সঙ্গে রেখে দিলো।

ফিসফিস করে সুজা বললো, 'মনে হয় ওই সেলটায় বাগ নেই, তাহলে এতোক্ষণে চলে আসতো চীফের লোক। আর আমি ওটাতে ঢুকতে চাই না।'

'আমিও না। কিন্তু এখান থেকে বেরোতে হলে সাহায্য লাগবে আমাদের, একা একা পারবো বলে মনে হয় না।' চত্বর ধরে হাঁটছে রেজা। ধূসর হয়ে এসেছে পুবের আকাশ, ভোরের বেশি বাকি নেই।

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে প্রহরী আছে, তবে জেগে নেই, চেয়ারে বসে নাক ডাকাচ্ছে।

'বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার,' সুজা বললো। 'চীফ যখন দেখবে আমরা পালিয়েছি সব ঝাল ঝাড়বে ওর ওপর।'

'আস্তে কথা বল, নইলে পালাতে আর পারবো না।'

আস্তে মেইন হলের দরজা ঠেলে ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিলো রেজা। কেউ নেই।

ভেতরে ঢুকে পড়লো দু'জনে। সিঁড়ি দেখিয়ে দোতলায় যাবার ইশারা করলো সুজা। মাথা নাড়লো রেজা। হলের শেষ মাথায় একটা ওক কাঠের দরজার গায়ে লেখা 'চীফ', সেটা দেখালো সে। রাগ দেখা দিলো সুজার চেহারায়। রওনা হলো সেদিকে।

খপ করে তার হাত চেপে ধরে কানে কানে বললো রেজা, 'ওকে এখন দরকার নেই। বেরিয়ে যেতে হবে আগে আমাদের। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে নিশ্চয় কোনো ব্যবস্থা রেখেছে সে। বাবাকে একটা খবর পাঠাতে পারলে আর অসুবিধে হতো না। জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থেকে শুধু অপেক্ষা করবো সেনাবাহিনী আসার।'

চীফের দরজার পাশেই আরেকটা দরজায় লেখা রয়েছে: বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।

তালা লাগানো। তবে গার্ডের কাছ থেকে আনা চাবির একটা লেগে গেল তালায়। ভেতরে ঢুকলো ওরা। সামনে একটা খাটো বারান্দা। একধারে পাশাপাশি তিনটে দরজা। প্রথমটাতে লেখা, লাউঞ্জ। দ্বিতীয়টাতে, আরমারি। আর তৃতীয়টাতে, কম্যুনিকেশনস।

'পেয়ে গেছি!' রেজা বললো কম্যুনিকেশন রুমের দিকে তাকিয়ে।

'আমিও!' আরমারি লেখা দরজাটার দিকে চেয়ে আছে সুজা।

তিনটের একটা দরজাতেও তালা নেই। আরমারিতে ঢুকলো সুজা। রেজা চলে গেল কম্যুনিকেশন রুমে।

আরমারি তো নয় ওটা, পুলিশের দুঃস্বপ্ন, আর সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গ। চারপাশের দেয়ালে রয়েছে এম-১৬-এর র‍্যাক। ·২২৩ ক্যালি-

বার ম্যাটাল-জ্যাকেট বুলেটের অসংখ্য বাক্স একটার ওপর আরেক-টা সাজানো, ছাত ছুঁই ছুঁই করছে। বিরাট এক দেয়াল আলমা-রিতে রাখা সি-৪ প্ল্যাস্টিক এক্সপ্লোসিভের স্তূপ। ওই বোমা মেরে পুরো র‍্যাঞ্চ হাউসটা উড়িয়ে দেয়া যাবে। হাসি ফুটলো সুজার মুখে। ঘরের মাঝে একটা টেবিলে রাখা জিনিসপত্র একপাশে ঠেলে সরিয়ে কাজে লেগে গেল সে।

রেজা ঢুকেছে কম্যুনিকেশন রুমে। পরিচিত যন্ত্রপাতি। দুটো কমপিউটার আর একটা অতি আধুনিক রেডিও সেট। একটা কম-পিউটার দিয়ে আর কোনো কাজ হয় না, শুধু র‍্যাঞ্চের টেলিফোন সিসটেমকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর দ্বিতীয়টা দিয়ে মেসেজ পাঠানো সম্ভব, অ্যান্টেনা দেখেই বোঝা গেল। তবে মেসেজ পাঠাতে হলে পাসওয়ার্ড লাগবে। নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় যন্ত্রটার সামনে বসে পড়লো রেজা। পাসওয়ার্ড সে জানে না, তবে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে।

চল্লিশ মিনিটপর এসে কম্যুনিকেশন রুমে ঢুকলো সুজা। দেখলো, ঝড়ের গতিতে কমপিউটারের চাবি টিপে চলেছে তার ভাই। পর্দায় লেখা ফুটেছে : প্লীজ এনটার পাসওয়ার্ড।

'এতো ঝামেলার কি দরকার?' সুজা বললো। 'চীফ হারাম-জাদার টুঁটি টিপে ধরলেই তো বলে দেবে।' মুঠো ঝাঁকালো সে।

'আর কয়েক মিনিট,' রেজা বললো। 'আশা করছি বেরিয়ে যাবে।' কী-বোর্ড থেকে চোখ সরালো না সে।

'বেশ, আমি অপেক্ষা করছি,' শান্তকণ্ঠে বললো সুজা। 'তবে র‍্যাঞ্চবাসীদের অবাক করার মতো কয়েকটা কৌশল করে রেখে

এসেছি। এই পার মিনিট আষ্টেক সময় পাবে।'

চাবির ওপর স্থির হয়ে গেল রেজার আঙুল। মুখ তুললো। হাসছে তার ভাই। জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলো না রেজা, তর্ক করারও সময় নেই আর এখন। আবার দ্রুত চাবি টিপতে আরম্ভ করলো। 'তোর অবাক করার জিনিসগুলো যখন কাজ করবে, নিশ্চয় তখন ধারেকাছে থাকা চলবে না আমাদের।'

'না।'

কিভাবে এই কমপিউটারের সিকিউরিটি সিসটেম ভাঙতে হবে, হঠাৎ বুঝে ফেললো রেজা। চীফ খুব আত্মবিশ্বাসী। তাছাড়া এখানে তার যন্ত্রে হাত ছোঁয়ানোর সাহস করবে কেউ ভাববে না। তাই জটিল শব্দ ব্যবহার করবে না। পাসওয়ার্ডের শব্দটা তার মুখে প্রায় এসে গিয়েছিলো, না বলে সুজাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা বল্‌তো, চীফকে কি বললে সব চেয়ে বেশি মানায়?'

'কাউবয়,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো সুজা।

'ইয়েস, কাউবয়,' বলতে বলতেই ইংরেজিতে কাউবয় বানান করে খটাখট ছ'টা অক্ষর টিপে দিলো রেজা। ক্ষণিকের জন্যে শূন্য হয়ে গেল পর্দা, পরক্ষণেই কমপিউটারের ফাংশন আর ফাইলের মেনু ফুটে উঠলো পর্দায়।

সময় গুনে চললো সুজা, আর রেজা টিপতে থাকলো চাবি। বেপোটে তাদের বন্ধু আকরামের বাড়িতে ওর কমপিউটারকে মেসেজ পাঠাতে লাগলো।

'দাদা, এখুনি না বেরোলে বিপদে পড়ে যাবো,' উত্তেজিত হয়ে

উঠলো সুজা। আর শান্ত থাকতে পারছে না।

'আর একটু,' রেজা বললো। 'এই ফাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই। আমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে...'

'জবাবের অপেক্ষা করলে মরতে হবে,' ভাইয়ের হাত চেপে ধরে টেনে তুললো সুজা। ঘর থেকে বের করে নিয়ে এলো তাকে। হলরুমে বেরিয়ে দিলো দৌড়। শব্দ হচ্ছে কিনা সেটা এখন কোনো ব্যাপার নয়, কতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া যায় সেই চেষ্টা করছে। চত্বরে বেরিয়ে এলো ওরা।

পায়ের শব্দ নিশ্চয় প্রহরীর কানে গেছে। পেছনে চেঁচামেচি শোনা গেল তার।

চত্বরের পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে কোরালের দিকে ছুটলো সুজা। পেছনে রেজা। আস্তাবলের বাইরেই বাঁধা রয়েছে চীফের প্যালোমিনো ঘোড়াটা।

'একটাতে করেই যেতে হবে দু'জনকে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সুজা। 'আর দেখছি না।'

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়লো সে। কানের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট। মাথা নুইয়ে ফেললো সে। ইতিমধ্যে পেছনে চড়ে বসলো রেজা।

ঘোড়ার পেটে জুতোর খোঁচা মেরে চলার নির্দেশ দিলো সুজা। ইঙ্গিত পেয়ে তীরবেগে ছুটতে শুরু করলো শিক্ষিত অশ্ব। কোরাল থেকে বেরিয়ে তৃণভূমির ওপর দিয়ে ছুটলো বনের দিকে।

'রেললাইন ধরে এগিয়ে যাবো,' সুজা বললো।

পেছনে একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘটলো বিস্ফোরণ। পেছনে তাকিয়ে রেজা দেখলো, ট্রাকগুলোতে আগুন ধরে গেছে। আকাশে ওড়ার চেষ্টা করছে যেন ট্রেনের এঞ্জিনটা। ব্যর্থ হয়ে সারা গায়ে আগুন নিয়ে ভেঙেচুরে ঝরে পড়লো মাটিতে। যেন সিনেমায় স্লো মোশন ছবি দেখছে সে। চারদিকে ছোটাছুটি করে যে যেখানে পারছে আত্মগোপন করার চেষ্টা করছে চীফের লোকেরা।

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সুজা, 'আমাদের পিছু নিতে সময় লাগবে।'

'তা লাগবে,' একমত হলো রেজা। 'নিজেরা আস্ত রয়েছে কিনা সেটা বুঝতেই সময় লেগে যাবে অনেক, আসার প্রশ্ন তো তার পরে।'

হাসলো দু'জনেই।

লাইনের পাশ দিয়ে আধমাইল মতো ছুটে কমে এলো ঘোড়ার গতি। রাশ টেনে ওটাকে থামালো সুজা। তার জানা আছে, ভালো ঘোড়াও অতিরিক্ত জোরে একটানা দৌড়ালে অল্পক্ষণে হাঁপিয়ে পড়ে, এরপরও ছোটালে হৃৎপিণ্ড ফেটে গিয়ে মরার ভয় থাকে। এই জানোয়ারটাকে মারতে চাইলো না সে।

পিঠ থেকে নামলো দু'জনে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে গেছে ঘোড়াটার। ওটার পেটে আস্তে চাপড় দিয়ে সুজা বললো, 'ধন্যবাদ, প্যালো। যা, যেখানে খুশি চলে যা।'

ভারমুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ড জোরে জোরে দম নিলো

ঘোড়াটা। তারপর লাইনের পাশ দিয়ে ধীর কদমে চলতে শুরু করলো সামনের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে হাসলো সুজা :

'লাইনের কাছ থেকে সরে যাওয়া দরকার,' রেজা বললো।

দু'জনেই তাকালো পাশের ঘন জঙ্গলের দিকে।

'দাদা,' সুজা বললো, 'সত্যি কি এখানে হিংস্র জানোয়ার আছে? নাকি মিছে কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়েছে ওরা?'

'মনে হয় না,' রেজা বললো।

সাপ আর বাঘের ভয় উপেক্ষা করে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো ওরা। মাটি নরম, গাছপালা খুব ঘন, লতা এতো বেশি আর শক্ত যে হাঁটাই মুশকিল। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করছে মশা, মাথা ঘিরে চক্কর মারছে হাজারে হাজারে। আরও শত পদের পোকামাকড়ের গুঞ্জন চারিদিকে। গায়ের যেখানে সামান্যতম খোলা জায়গা পাচ্ছে, বসে যাচ্ছে মশা।

'চিহ্ন বোধহয় খুব একটা ফেলে যাবো না,' পেছনে তাকিয়ে বললো সুজা। 'আমরা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে আবার আগের মতো হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল।'

'হ্যাঁ, যেন গিলে নিয়েছে,' রেজা বললো। 'এখন কোনোমতে লোকালয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। প্রথমে গিয়ে ইউ এস অ্যাম-বেসিতে যোগাযোগ করতে হবে। ওরাই পুলিশকে বলবে। তখন যা করার করবে পুলিশ।'

'আমরাও মোটামুটি করে এসেছি,' হেসে বললো সুজা। 'ট্রাক শেষ, ট্রেন শেষ,' বলতে বলতেই গালে থাপ্পড় মারলো, মশা।

'বাপরে, একেবারে ড্রাকুলা! রক্ত আর রাখবে না…,' হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে রেজাকে সরিয়ে দিলো সে।

মাটিতে পড়তে পড়তেও কোনোমতে সামলে নিলো রেজা। 'এই, কি…' সুজার নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে পেয়ে গেল জবাব।

মুহূর্ত আগে যেখানে পা ফেলতে যাচ্ছিলো সেখানেই শুয়ে ছিলো কালো সাপটা। এখন মাথা তুলেছে। চকচকে, নিষ্পলক, শীতল চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেদের দিকে। ছোবল মারবে কি মারবে না মনস্থির করতে পারছে না যেন। বারকয়েক হিসহিস করে শাসালো ওদের, তারপর মাথা নামিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো ঝোপের ভেতর।

'থ্যাংকস,' বললো রেজা। 'একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল, সাপ আছে।'

জাগুয়ার আছে, সেটাও জানা গেল খানিক পরেই। বন কাঁপিয়ে দিয়ে গর্জন করে উঠলো ওটা। পরক্ষণেই একটা করুণ আর্তনাদ। নিশ্চয় শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জানোয়ারটা। কাছেই কোথাও।

চোদ্দ

পায়ের সামনের মাটিতে যেন গর্তের মালা তৈরি করলো একঝাঁক বুলেট, সেমিঅটোম্যাটিক অস্ত্র থেকে ছোঁড়া হয়েছে। থমকে দাঁড়ালো সুজা। পেছনে তার প্রায় গায়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রেজা।

অনেক দূর দিয়ে জাগুয়ারটার পাশ কাটিয়ে এসে এগিয়ে চলেছিলো ওরা, হঠাৎ এই গুলি।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো চারজন মানুষ। পরনে সৈনিকের ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম, মাথায় হেলমেট। হাতে সেমি-অটোম্যাটিক রাইফেল।

রাইফেল তুলে এগিয়ে এলো ওরা। চেহারাই বলে দিচ্ছে, সামান্যতম সুযোগ দিলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।

ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুললো রেজা। বললো, 'আমেরিকানোস!' অর্থাৎ ওরা আমেরিকান।

হাসি ফুটলো লোকগুলোর মুখে।

'ইংরেজি বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলো রেজা। 'ইংগল্‌স্‌?'

ইউনিফর্মে তিন ফিতে লাগানো একজন সৈনিক হাসিমুখে মাথা নাড়লো। হাত নেড়ে অনুসরণ করতে বললো ওদের। ওরা দু'জন এগোলো, পিছু নিলো অন্য তিনজন।

'আমাদের কি মনে করেছে ওরা,' সুজা বললো, 'গেরিলা?'

'কি জানি!' রেজা বললো। 'তবে বন্ধু বলেই তো ধরে নিয়েছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক।'

আধ ঘণ্টা সোজা চলার পর মোড় নিলো ওরা। তারপর আরও বিশ মিনিট হেঁটে, জঙ্গলের একটা মিলিটারি আউটপোস্টে পৌঁছলো। ক্যাম্প ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া। বাংকার বানিয়ে তাতে মেশিন-গান বসানো হয়েছে।

লোকগুলোর সঙ্গে সামনের গেট দিয়ে ঢুকলো রেজা সুজা। ওদেরকে নিয়ে আসা হলো একটা তাঁবুতে। একজন অফিসার বসে আছে ভেতরে।

তিন ফিতেওয়ালা সার্জেন্ট স্প্যানিশে কিছু বললো অফিসারকে।

দুই ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে অফিসার পরিষ্কার ইংরেজিতে বললো, 'তাহলে তোমরা আমেরিকান। কি হয়েছিলো? এই জঙ্গলে এলে কি করে?'

অনেক রেখেঢেকে, অনেক কিছু বাদ দিয়ে, মোটামুটি একটা সত্য গল্প বানিয়ে বললো দু'জনে।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালো অফিসার, ওদের কথা বিশ্বাস করলো বলে

মনে হলো না। 'কিন্তু এটা টুরিস্ট স্পট নয়। আজতক কাউকে আসতে দেখিনি।'

'আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?' রেজা বললো।

'বিশ্বাস না হলে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুন ওই র‍্যাঞ্চ,' বললো সুজা।

মাথা ঝাঁকালো আবার অফিসার, 'বিশ্বাস না হবারই কথা। যে গল্প শোনালে। তবে র‍্যাঞ্চটার কথা কানে এসেছে আমাদের। আমরা শুনেছি, কোন এক খেপাটে লোক এসে র‍্যাঞ্চ করেছে বনের ভেতর, ফসল-টসল ভালোই ফলাচ্ছে। এই কাণ্ড যে করছে জানতাম না।'

উঠে দাঁড়ালো সে। 'তোমরা এখানে বসো। রেডিওতে কথা বলে আসি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে। দেখি কি বলে। একা সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস করতে পারছি না।'

অফিসার বেরিয়ে যাওয়ার পর সুজা বললো, 'ক্যাপ্টেন র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করতে গেলে যদি আমাদের সঙ্গে নিতো। চীফের মুখটা কেমন হয় দেখতে পারতাম।'

'যা খুশি হোকগে,' রেজা বললো। 'আমি শুধু হেসকে ধরতে আগ্রহী। ধরে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাই। নইলে মিস্টার কুপার-কে জেল থেকে বের করা যাবে না।'

মুখে হাসি নিয়ে ফিরে এলো ক্যাপ্টেন। 'গুড নিউজ,' বললো সে। 'তোমাদেরকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছে। ওদেরকে গিয়ে খুলে বলবে সব। তারপর ওরা ঠিক করবে কিভাবে আক্রমণ চালানো যায়।'

'ভালোই হবে,' সুজা বললো। 'আমাদেরকে সঙ্গে নেবে তো?'

'যেতে চাও? ব্যবস্থা করা যাবে। খবর-টবর সব কিছু তো তোমরাই দিলে।...তো, খেতে চাও নাকি কিছু?'

'নিশ্চয়,' সুজা বললো। 'শেষ যে কখন খেয়েছি ভুলেই গেছি। আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারবো।'

'জাগুয়ারের কথা বলিসনি, রক্ষে,' হেসে বললো তার ভাই।

'ওসব তো পাবে না, শুধু বাসি গরুর মাংস,' ক্যাপ্টেনও হাসলো। 'দেখো, খেতে পারো কিনা।'

বাড়িয়ে বলেছে ক্যাপ্টেন। মাংস যথেষ্ট তাজা। মোটেই খারাপ নয় খেতে। প্রচুর পেঁয়াজ কুঁচি, আর সেই সাথে সেদ্ধ আলু এবং সালাদ। আরও আছে। সবশেষে এলো চকোলেট আইসক্রীম।

'দারুণ খাওয়ালেন, ভাই,' দ্রুত শেষ চামচ আইসক্রীম মুখে পুরে বললো সুজা। হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ক্যাপ্টেন,' রেজা বললো।

'এইটুকু অন্তত করা উচিত, কি বলো?' পেছন থেকে বললো একটা কণ্ঠ। 'মরার আগে একজন মানুষকে ভালোমতো একবার খাওয়াবো না, কথা হলো নাকি।'

কে কথা বলেছে বোঝার জন্যে দেখার প্রয়োজন হলো না। কণ্ঠস্বরেই চিনতে পারলো ওরা। লেমিল।

ধীরে ধীরে ফিরে তাকালো দু'জনে। লেমিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারিয়ানো। হাতে ·৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো রেজা, 'আপনিও এদেরই দলে!'

শ্রাগ করলো ক্যাপ্টেন। ঝুঁকে বসলো চেয়ারে। অলস হাসি খেলা করছে মুখে। 'কি আর করবো বলো, সরকার বেতন যা দেয় তাতে পোষায় না। জঙ্গলের ডিউটি ছেলেখেলা নয়। তাছাড়া তোমাদের মতো কিছু বোকাকে ধরলে একঘেয়ে জীবনে কিছুটা উত্তেজনা আসে, বিনিময়ে টাকাও পাই চীফের কাছ থেকে। আর খাবার তো পাঠায়ই, একটু আগে যা খেলে তোমরা। সরকার এতো কিছু দেয় না।'

'এই দুটোর জন্যে বোনাসও পাবে,' কথা দিলো ক্যাপ্টেনকে লেমিল। ছেলেদের দিকে তাকালো। 'আগেই বলা হয়েছে তোমাদের, পালাতে পারবে না। সবাইকেই আমরা সাবধান করে দিই। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। ভ্যাগিস, ক্যাপ্টেনের লোকের হাতে পড়েছো। ডাকাতদের হাতে পড়লে এতোক্ষণে কখন জবাই হয়ে যেতে।'

পিস্তল নেড়ে রেজা সুজাকে ওঠার ইশারা করলো মারিয়ানো। 'এসো। চীফ অস্থির হয়ে আছে,' কুৎসিত হাসি হাসলো সে।

পিস্তলের মুখে দুই ভাইকে হেলিকপ্টারের কাছে নিয়ে আসা হলো।

ফেরার পথে আর একটা কথাও হলো না।

হেলিকপ্টার নামতেই ঘিরে ফেললো দশজন অস্ত্রধারী গার্ড। পালানোর আর সুযোগ দিতে রাজী নয় চীফ। এমনিতেই অনেক মজা নষ্ট হয়েছে তার।

'যাক, এসেছো,' চীফ বললো। 'দেখে কি যে খুশি লাগছে।'

চোয়াল শক্ত, রাগে মুখ ফ্যাকাশে। দুষ্টু ছেলের কাছ থেকে খেলনা কেড়ে নিলে যেমন হয়, অনেকটা সেরকমই হয়েছে তার চেহারা।

বোমায় কি কি ক্ষতি হয়েছে, দেখছে দুই ভাই। পোড়া ট্রাকগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছে এখনও। বিশাল এক মরা দৈত্যের মতো লাইনের পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে লোকোমোটিভ এঞ্জিনটা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার যখন চীফের দিকে তাকালো ওরা, দেখলো আরো রেগে গেছে সে। হাত নেড়ে গার্ডদের সরে যাওয়ার ইশারা করলো চীফ। পিস্তল বের করে তুলে ধরলো।

'একটা পার্টি দিতে যাচ্ছি আমরা, তিক্তকণ্ঠে বললো সে, 'আর তোমরা হবে আমাদের মজার খোরাক। এই, যারা যারা আছে, সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। দেখাতে চাই, আমার সঙ্গে গোলমাল করে বেরোতে চাইলে কি অবস্থা হয়।'

লোকজনকে খেদিয়ে আনতে লাগলো গার্ডেরা, বাড়ি থেকে, ব্যারাক থেকে, মাঠ থেকে। তিনজনের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো সবাই। বন্দিদের পেছনে রাইফেল উঁচিয়ে রইলো প্রহরীরা, যে কোনো রকম সম্ভাবনার জন্যে তৈরি।

'আর এখানে গণ্ডগোল চাই না আমরা,' চেঁচিয়ে বললো চীফ। 'এরা দু'জন করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই দেখতে পাবে, আমার সঙ্গে শয়তানী করলে কি ফল হয়।'

দুই ভাইয়ের কাছে এগিয়ে এলো চীফ। জঙ্গলে কালো সাপটাকে যে দেখেছিলো ওরা, ঠিক সেই রকম দৃষ্টি এখন তার চোখে। মোলায়েম গলায় বললো, এতোই আস্তে শুধু ওরা দু'জনই শুনতে

পেলো, 'কোনো শেষ ইচ্ছে থাকলে বলতে পারো।'

রেজা তাকালো তার ভাইয়ের দিকে। 'সুজা, এবার হয়তো সত্যি ।' পকেটে হাত দিলো সুজা। ভাইয়ের কথাটা শেষ করলো এভাবে, 'মজা হবে।' এবং পরক্ষণেই তাদের চারপাশে যেন বিস্ফোরিত হলো ধরণী।

পনেরো

বেঁচে গেছে রেজা, কিন্তু বুঝতে পারছে না কিভাবে। চিত হয়ে পড়ে আছে। কানে তালা, হতবুদ্ধি। শুধু দেখতে পাচ্ছে ধোঁয়া, আর ধুলো। ওগুলোর মাঝে আবছা চোখে পড়ছে চীফের হাতের পিস্তলটা চলে এসেছে সুজার হাতে, ওটা চীফের কানে ঠেসে ধরেছে সে।

থমথম করছে সুজার চেহারা। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠলো রেজা। দেখলো, বন্দি আর প্রহরীরাও তার মতোই দ্বিধাগ্রস্ত। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ফিরে তাকিয়ে ওটা দেখতে পেলো না। অবাক হয়ে আবার যখন সুজার দিকে ফিরলো, মাথা ঝাঁকালো সুজা। বোকা হয়ে গেছে যেন চীফ, স্তব্ধ হয়ে তাকাচ্ছে সেদিকে, খানিক আগেও যেখানে ছিলো তার ছোট্ট রাজত্ব।

চেঁচিয়ে কিছু বললো সুজা। মাথা নাড়লো রেজা, তার কানের দিকে আঙুল তুলে আবার মাথা নাড়লো। কানে পিস্তল ধরে

রেখেই কলার ধরে টেনে চীফকে ভাইয়ের কাছে নিয়ে এলো সুজা, আরও জোরে চেঁচিয়ে বললো, 'পেছনে দেখো। সেনা-বাহিনী এসে গেছে!'

ফিরে তাকালো রেজা। দেখলো, গাছপালার প্রায় মাথা ছুঁয়ে উড়ছে সৈন্যবাহী তিনটে বিশাল হেলিকপ্টার। স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রহরীরা। লড়াইয়ের ইচ্ছে উবে গেছে। বন্দুক ফেলে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিলো দু'জন আচমকা। একটা হেলিকপ্টার ধেয়ে গেল তাদের দিকে, থেমে গেল ওরা। পায়ে পায়ে আবার ফিরে এলো আগের জায়গায়।

হেলিকপ্টার নামলো। বেরিয়ে আসতে লাগলো সৈন্যরা। চেঁচিয়ে আদেশ দিতে শুরু করলো, 'অ্যামিগোজ! অ্যামিগোজ!'

'ফেলে দে,' ভাইয়ের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো রেজা, 'পিস্তলটা ফেলে দে! নইলে গুলি করে বসবে!'

হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিলো সুজা, কিন্তু চীফের কলার ছাড়লো না।

কমাণ্ডার নামলেন। তাঁর পাশে আরেকজনকে নামতে দেখে হাঁ হয়ে গেল দুই ভাই। 'বাবাআ!' চিৎকার করে ডাকলো সুজা।

হেসে হাত নাড়লেন মিস্টার মুরাদ। এগিয়ে এলেন। 'এই যে, ভালোই আছো দেখছি,' হেসে বললেন তিনি। 'একটু দেরিই করে ফেললাম আসতে। মাঝরাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে এক গল্প শোনালো তোমাদের বন্ধু আকরাম। তারপর থেকে শুধু উড়ছি আর উড়ছি। তবু দেরি হয়ে গেল।'

'হয়নি বাবা,' রেজা বললো, 'আর কয়েক সেকেণ্ড পরে এলেই হয়তো হতো। বাঁচালে। কামান ছুঁড়েছিলো নাকি হেলিকপ্টার থেকে?'

'না তো!' অবাক হলেন মিস্টার মুরাদ।

ঝট করে ভাইয়ের দিকে তাকালো রেজা। হাসছে সুজা।

'এই, তাহলে তোর কাজ!' রেজা বললো। 'কি করেছিস!'

হো হো করে হাসলো সুজা। 'দাঁড়াও, বলছি।' কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো চীফকে। বললো, 'যাও, মিয়া, ভেড়া বনে থাকোগে এখন তোমার কোরালে।' তার প্রহরীদের মতো তাকেও খেদিয়ে কোরালে নিয়ে চললো সৈনারা। একখানে করছে সব শয়তানকে। সেদিকে তাকিয়ে আরেকবার হাসলো সুজা। তারপর পকেট থেকে টেনে বের করলো একটা ছোট্ট যন্ত্র, ওয়াকি-টকির মতো দেখতে। 'চীফের আরমারিতে এটা দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, তুলে নিলাম। ভাবলাম, যদি সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়ি, এটা ব্যবহার করে হয়তো পালানোর পথ করে নিতে পারবো।'

থেমে বাবা আর ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো সে। হাসি ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। 'আর পালাতে যদি না ও পারি, চীফের সর্বনাশ করে দিয়ে যেতে পারবো, ভাবলাম। কাজেই পুরো এক বাক্স প্ল্যাস্টিক বোমায় ডেটোনেটর লাগিয়ে রেখে এসেছিলাম। এই যন্ত্রটার বোতামে শুধু একটা টিপ, ব্যস, তাসের ঘরের মতো উড়ে গেল চীফের স্বপ্নরাজ্য।'

বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও রেজা। 'তাহলে আগে বলিসনি

কেন আমাকে ? হুঁশিয়ার থাকতে পারতাম। আমাদেরও মরার ঝুঁকি ছিলো, বুঝতে পারিসনি ?'

'পেরেছি,' সুজা বললো। 'তুমি হলে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, বললে হয়তো ব্যবহারই করতে পারতাম না এটা। তাছাড়া এমনিতেও তো মরতেই যাচ্ছিলাম

'কিন্তু···কিন্তু···'

হাত তুলে বাধা দিলেন মুরাদ, 'থাক, হয়েছে। তর্ক পরেও করতে পারবি। ওই যে, এক ভদ্রলোক এসেছেন, তোদের ধন্যবাদ জানাবেন।' দুই ছেলের হাত দুই বগলে চেপে টেনে নিয়ে এগোলেন তিনি। সামনের হেলিকপ্টারটায় বসে আছেন সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষ। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। স্পেশাল ফোর্সের জেনারেল ওরটেগা ফ্রেনটিস-এর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন মুরাদ।

'কংগ্রাচুলেশন, মাই বয়েজ,' ইংরেজিতে বললেন জেনারেল, কথায় স্প্যানিশ টান, 'আমাদের প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের। বেশ কিছুদিন ধরেই এই জায়গাটার কথা জানি আমরা, কিন্তু ব্যবস্থা নিতে পারছিলাম না। আমাদের দেশের একটা মারাত্মক ক্যান্সার সারালে তোমরা।'

হেলিকপ্টার থেকে নামলেন তিনি। তাকালেন এককালের সুন্দর র‍্যাঞ্চহাউসের পোড়া ধ্বংসস্তূপের দিকে।

'জানেন আপনারা!' রেজা বললো, 'তবু তাকে এতোদিন ধরলেন না কেন, জেনারেল ?'

'রেজা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেনারেল, 'টাকার কাছে দুর্বল হয়ে যায় মানুষ। নিজের ঘরেই যদি বিশ্বাসঘাতক থাকে, কি করে কি করবো? আমি নিশ্চিন্ত, আশেপাশে যে কজন তরুণ ফীল্ড অফিসার আছে আমার, সব করাপটেড।'

'স্যার,' জঙ্গলে দেখা ক্যাপ্টেনের কথা বললো সুজা, 'আপনার ঝুড়ির সব আপেলই পচা কিনা জানি না, তবে পচে একেবারে গলে গেছে এরকম একজনকে দেখাতে পারি।'

'কিন্তু,' সন্তুষ্ট হতে পারলো না রেজা, 'চীফকে এখন যে ধরলেন? এখন সমস্যা হবে না?'

'আকরামের কাছে কমপিউটার ফাইল যেগুলো পাঠিয়েছো,' মুরাদ বললেন রেজাকে, 'পড়ে দেখেছো কোনোটা? ওগুলো ডিনামাইট। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ডিনামাইট একেকটা। এই দেশের, এবং আরও কয়েকটা দেশের ওপরতলার লোক সবাই। ওদেরকে ব্যবহার করতো চীফ। ব্ল্যাকমেল করতো। কারও কাছ থেকে নগদ টাকা নিতো, কারও কাছ থেকে তথ্য। ওগুলো আবার ভিন্ন লোকের কাছে অনেক দামে বিক্রি করতো।'

'সরকার বিরোধী আর সন্ত্রাসীদের অভাব নেই আমাদের দেশে,' জেনারেল বললেন। 'একটা ফাইল পড়ে জেনেছি, এখান থেকে বেশ কয়েকটা গ্রুপকে অস্ত্র সরবরাহ করতো চীফ। ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতো এই র‍্যাঞ্চকে ওরা। হামলা চালাতো বিভিন্ন জায়গায়। ওরকম একটা হামলায় মারা গেছে আমার স্ত্রী, ফাইল পড়ে জানলাম, এখান থেকেই সেটার পরিকল্পনা হয়েছে।' ক্ষণিকের

জন্যে বেসামাল হয়ে পড়লেন জেনারেল। 'সরকারের তরফ থেকে তো বটেই, আমার নিজের তরফ থেকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের।'

'এখন আপনার একটাই ভাবনা,' পরিবেশ হালকা করার জন্যে বললো সুজা, 'নতুন জেলখানা বানানো। পুরনোগুলোতে নিশ্চয় জায়গা হবে না এতোগুলোর।'

হাসলেন জেনারেল। র‍্যাঙ্কের ধ্বংসস্তূপের ওপর চোখ বোলালেন আরেকবার। তারপর রেজা সুজার সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বললেন, 'তোমাদের ঋণ শোধ করার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছি আমি, বড়দিনের উৎসবে আমার বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে ফেলা...'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠলো সুজা, 'হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম!'

'কী?' অবাক হলেন জেনারেল। তিনি ভাবলেন, এই কেসের জরুরী কোনো কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেছে। কিংবা সাংঘাতিক কোনো একজন অপরাধী পালিয়ে গেছে।

'বড়দিন!' বললো সুজা। 'বাজার করাই বাকি রয়ে গেছে আমাদের। প্রেজেন্টেশন কি আর দু'একটা। অ্যানি, জেনি, ইরা, মেরি... হায় হায়রে, আর সময় নেই!' কপাল চাপড়ালো সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন জেনারেল।

হাসতে হাসতে মুরাদ বললেন, 'ভাবিসনে, খোকা। আরও চার চারটে দিন বাকি। রেপোর্টের সমস্ত মেয়েকেও যদি উপহার দিতে চাস, তা-ও অসুবিধে হবে না, কেনার সময় পাবি।'

'কিনতে তো সময় লাগে না,' রেজা বললো হেসে, 'সময়টা লাগে ওর ঠিক করতে, কাকে কি দেবে। একেবারে কমপিউটারের সাহায্য নিতে হয়।'

হাসতে শুরু করলেন জেনারেল। ফিকফিক থেকে হা-হা, তারপর পুরোপুরি অট্টহাসি। হালকা হয়ে গেল পরিবেশ।

—: শেষ :—